মো. মাহমুদ আলম

# বাগআঁচড়া বাজার সম্মুখযুদ্ধ মুক্তিযোদ্ধাদের সাফল্যের ইতিহাস

১৯৪৭ এ দেশভাগের পর বর্তমানের বাংলাদেশ পূর্ব পাকিস্তানের অন্তর্ভূক্ত হলে পশ্চিম পাকিস্তানি শাসকগোষ্ঠী বাঙালি অধ্যুষিত এ অঞ্চলের প্রতি যে বৈষম্যমূলক আচরণ করতে শুরু করে তার চূড়ান্ত পরিণতি ঘটে ১৯৭১ সালের চাপানো যুদ্ধের মাধ্যমে। এটি ছিল পশ্চিম পাকিস্তানিদের জন্য তাদের অস্তিত্ব রক্ষার শেষ চেষ্টা, কিন্তু এ অঞ্চলের জনগোষ্ঠীর জন্য তাদের মুক্তি ও অধিকার প্রতিষ্ঠার সংগ্রাম।[১] প্রকৃতপক্ষে এ ভাষণ থেকে বঙ্গবন্ধু শাসকগোষ্ঠীকে হুঁশিয়ারি দিয়ে বলেন যে, "...প্রত্যেক ঘরে ঘরে দূর্গ গড়ে তোল। তোমাদের যা কিছু আছে তাই নিয়ে শত্রুর মোকাবেলা করতে হবে।" এরপর বক্তৃতার একেবারে শেষ পর্যায়ে তিনি আরো নির্দিষ্ট করে বলেন যে, "...কিন্তু যদি এদেশের মানুষকে খতম করার চেষ্টা করা হয়, বাঙালিরা বুঝে শুনে কাজ করবেন। প্রত্যেক গ্রামে, প্রত্যেক মহল্লায় আওয়ামী লীগের নেতৃত্বে সংগ্রাম পরিষদ গড়ে তোল এবং তোমাদের যা কিছু আছে তাই নিয়ে প্রস্তুত থাকো। মনে রাখবা, রক্ত যখন দিয়েছি, রক্ত আরো দিব। এদেশের মানুষকে মুক্ত করে ছাড়বো ইনশাল্লাহ।" এরপর মার্চের ১৬ থেকে ২৪ তারিখ পর্যন্ত অত্যন্ত গোপনীয়তার সঙ্গে চলা বৈঠক পুরোপুরি ব্যর্থ হলো। আর ঐ সময়ের মধ্যে পশ্চিম পাকিস্তান থেকে শিপিং কর্পোরেশনের জাহাজে করে অস্ত্র ও সৈন্য আনার খবর প্রকাশ হয়। আসলে "আলোচনার আড়ালে পাকিস্তানিরা মূলত রণসাজে সজ্জিত হয়েছে।"[২] এরূপ পরিস্থিতিতে পাকিস্তানি শাসকগোষ্ঠী ২৫ মার্চ রাতে অপারেশন সার্চলাইট নামে গণহত্যা শুরু করে এবং এর প্রতিক্রিয়ায় বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান ২৬ মার্চের প্রথম প্রহরে স্বাধীনতা ঘোষণা করেন। পরদিন বেতার থেকে স্বাধীনতার এ ঘোষণা শুনার পর বঙ্গবন্ধুর ৭ই মার্চের নির্দেশনা অনুযায়ী বাঙালিরা যুদ্ধে ঝাপিয়ে পড়ে।[৩] যুদ্ধের প্রাথমিক পর্যায়ে পাকবাহিনী কিছুটা সফলতা লাভ করলেও সময়ের সাথে সাথে যুদ্ধে বাঙালিদের অংশগ্রহণ বৃদ্ধি ও কৌশলের কাছে পরাস্ত হয়ে তারা বিপর্যয়ের মুখোমুখি হতে শুরু করে। সারাদেশে মুক্তিবাহিনী অত্যন্ত সাহসিকতার সঙ্গে অসংখ্য আঞ্চলিক যুদ্ধে তাদের মোকাবিলা করতে থাকে। কিন্তু দেশের কোথায় কোথায় এ ধরনের যুদ্ধ সংঘটিত হয়েছিল স্বাধীনতার পঞ্চাশ বছরেও তার পূর্ণাঙ্গ চিত্র পাওয়া যায়নি। ঠিক এ ধরনের একটি যুদ্ধ সংঘটিত হয়েছিল যশোরের শার্শা উপজেলার বাগআঁচড়া বাজারে যা 'বাগআঁচড়া বাজার সম্মুখযুদ্ধ' হিসেবে পরিচিত।[৪] এলাকাটি অত্যন্ত পুরনো ও সমৃদ্ধশালী জনপদ এবং সেই যুদ্ধ অত্র এলাকায় অবস্থানরত পাক মিলিশিয়াদের সমস্ত শক্তি এবং গর্বকে ধুলোয় মিশিয়ে দেয়। কিন্তু এতদিন যাবৎ নানাবিধ কারণে সেই যুদ্ধ সম্পর্কে দেশবাসী জানতে পারেনি। আলোচ্য প্রবন্ধে প্রধানত বাচনিক ইতিহাস পদ্ধতির মাধ্যমে 'বাগআঁচড়া বাজার সম্মুখযুদ্ধ' সম্পর্কে বিস্তারিত তথ্য-উপাত্ত অনুসন্ধানের চেষ্টা করা হয়েছে।

## বাগআঁচড়ার অবস্থান

বাংলাদেশের সবচেয়ে পুরাতন জেলা যশোর যা ১৭৮১ সালে গঠিত হয়। দেশের দক্ষিণ-পশ্চিমাঞ্চলে অবস্থিত এই জেলায় ৮টি উপজেলা রয়েছে যার মধ্যে শার্শা একটি। এর আয়তন ৩৩৬.৩৪ বর্গ কিলোমিটার। ২২°৫৫ থেকে ২৩°১২ উত্তর অক্ষাংশ এবং ৮৮°৫১ থেকে ৮৯°০১ পূর্ব দ্রাঘিমাংশে এর অবস্থান। এর উত্তরে ভারতের পশ্চিম বাংলা রাজ্য এবং চৌগাছা উপজেলা, দক্ষিণে কলারোয়া উপজেলা, পূর্বে ঝিকরগাছা উপজেলা এবং পশ্চিমে ভারতের পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য। আর শার্শা উপজেলায় ১১টি ইউনিয়ন রয়েছে যার মধ্যে বাগআঁচড়া অন্যতম যা উপজেলাটির সর্বদক্ষিণে অবস্থিত। বাগআঁচড়া গ্রামে অবস্থিত হওয়ায় এই ইউনিয়নের নাম বাগআঁচড়া। গ্রাম বিবেচনায় এর উত্তরে পিঁপড়াগাছি, দক্ষিণে ইলিশপুর (কলারোয়া উপজেলার কেরালকাতা ইউনিয়নের একটি গ্রাম), পূর্বে শংকরপুর (ঝিকরগাছা উপজেলার শংকরপুর ইউনিয়নের একটি গ্রাম) এবং পশ্চিমে সোনাতনকাটি এবং বসতপুর গ্রাম অবস্থিত। বিভিন্ন কারণে বাগআঁচড়া গ্রামটি স্বতন্ত্র বৈশিষ্ট্যের অধিকারী। একসময় গ্রামীণ সংস্কৃতির আধার ছিল এটি।[৫] ১৯৪৭ সালের দেশভাগ, ১৯৬৫ সালের ভারত-পাকিস্তান যুদ্ধ এবং ১৯৭১ সালের মুক্তিযুদ্ধের সময় বাগআঁচড়া থেকে হিন্দু সম্প্রদায়ের অনেক মানুষ দেশত্যাগ করতে বাধ্য হন। তারপর থেকে আজ অবধি অত্র এলাকায় মুসলমানরাই সংখ্যাগরিষ্ঠ।

### গবেষণার উদ্দেশ্য

আলোচ্য গবেষণার সাধারণ উদ্দেশ্য হলো বাগআঁচড়া বাজার এলাকায় সংঘটিত পাক মিলিশিয়া এবং মুক্তিযোদ্ধাদের মধ্যেকার সম্মুখযুদ্ধ সম্পর্কে বিস্তারিত তথ্য-উপাত্ত অনুসন্ধান করা। তবে কয়েকটি বিশেষ উদ্দেশ্য নিয়ে এই গবেষণা পরিচালিত হয়েছে যা নিম্নরূপঃ

- ক. মুক্তিযুদ্ধের প্রাক্কালে বাগআঁচড়ার রাজনৈতিক অবস্থা কেমন ছিল?
- খ. এমন কী পরিস্থিতি সৃষ্টি হয়েছিল যে বাগআঁচড়া বাজারে সম্মুখযুদ্ধ অপরিহার্য হয়ে উঠেছিল?
- গ. এ সম্মুখযুদ্ধে কারা অংশগ্রহণ করেছিলেন এবং কীভাবে যুদ্ধ সংঘটিত হয়েছিল?
- ঘ. যুদ্ধ পরবর্তী বাগআঁচড়া বাজার এবং এতদসংশ্লিষ্ট এলাকার অবস্থা কেমন ছিল?

### গবেষণা পদ্ধতি

আলোচ্য প্রবন্ধ রচনায় সম্পূর্ণভাবে বাচনিক ইতিহাস পদ্ধতি[৬] (Oral History Method) প্রয়োগ করা হয়েছে। বাচনিক ইতিহাস একইসঙ্গে গবেষণা পদ্ধতি এবং গবেষণাফল যা ইতিহাস গবেষণায় তুলনামূলকভাবে একটি নতুন ধারা হিসেবে বিবেচিত হতে পারে।[৭] আর প্রকৃতিগত বিচারে আলোচ্য প্রবন্ধটি মূলত গুণগত প্রকৃতির। প্রবন্ধে প্রাথমিক ও মাধ্যমিক উৎস ব্যবহৃত করা হলেও এখানে প্রধানত প্রাথমিক উৎসের সফল প্রয়োগ করা হয়েছে। প্রাথমিক উৎসের মধ্যে রয়েছে বাগআঁচড়া যুদ্ধে অংশগ্রহণকারী মুক্তিযোদ্ধাদের প্রত্যক্ষ সাক্ষাৎকার এবং যুদ্ধের সময়ে ও পূর্বাপর অবস্থানরত ঐ এলাকার ব্যক্তিগণ যারা যুদ্ধ সম্পর্কে তথ্য-উপাত্ত প্রদান করতে পারেন। আর মাধ্যমিক বা দৈতয়িক উৎস হিসেবে সীমিত পরিসরে লিখিত উপাদান ব্যবহার করা হয়েছে যা সাক্ষাৎকার সূত্রে পাওয়া তথ্য-উপাত্ত যাচাই-বাছাইয়ে ব্যবহার করা হয়েছে। যেহেতু বাগআঁচড়া বাজারটি দেশের প্রত্যন্ত এলাকায় এবং যুদ্ধের ঘটনা পঞ্চাশ বছর পূর্বের সেই কারণে অংশগ্রহণকারী যোদ্ধাদের সকলেই জীবিত নেই, কেউ কেউ বেঁচে থাকলেও তাঁদের স্মৃতি শক্তি প্রখর নেই। এতসব কারণে তাঁদের সাক্ষাৎকার গ্রহণের ক্ষেত্রে গবেষককে যথেষ্ট সতর্ক থাকতে হয়েছে। আবার যারা পূর্বাপর ঘটনার প্রত্যক্ষদর্শী ছিলেন তাদের কেউ কেউ সামাজিক ও নিরাপত্তাজনিত কারণে সাক্ষাৎকার দিতে সম্মত হননি। ফলে ধারণকৃত সাক্ষাৎকার প্রথমে লিপ্যন্তর (transcribe) করে তারপর সমগ্র তথ্য-উপাত্তের চেক এবং ক্রসচেকপূর্বক যৌক্তিক অবরোহী প্রক্রিয়ায় বিশ্লেষণ করে প্রকৃত ঘটনা নির্ণয় করতে হয়েছে। তবে পুরো প্রক্রিয়ায় বৃহদার্থে ঐতিহাসিক পদ্ধতি (Historical Method) ব্যবহৃত হয়েছে যেখানে পূর্ববর্তী পন্থা'র[৮] (Retrospective Approach) সফল প্রয়োগ করা হয়েছে। আর তথ্য-উপাত্ত বিশ্লেষণ ও উপস্থাপনের ক্ষেত্রে প্রধানত কালানুক্রমিক সংশ্লেষ পদ্ধতি (Chronological Synthesis Approach) প্রয়োগ করা হয়েছে।

### মুক্তিযুদ্ধের প্রাক্কালে বাগআঁচড়া

১৯৪৭ সালের ১৪ আগস্ট ব্রিটিশ শাসন থেকে পাকিস্তান স্বাধীনতা লাভ করলে এলাকাটি পূর্ব পাকিস্তানের অন্তর্ভুক্ত হয়। কিন্তু বাগআঁচড়া ভারতীয় সীমান্তের একেবারে কাছে (প্রায় ১২ কিলোমিটার) অবস্থিত হওয়ায় মুসলিমদের প্রতি ভারতীয়দের শত্রুভাবাপন্ন মনোভাব সম্বন্ধে অত্র এলাকার সাধারণ মানুষ সহজে অনুধাবন করতে পারেন। কেননা, ১৯৪৬ সালের কলকাতা দাঙ্গা এবং দেশভাগের আঘাত সহ্য করে পশ্চিম বাংলার মুসলমানদের একটি অংশ বাগআঁচড়া এবং এর আশেপাশে শরণার্থী বা বিতাড়িত হিসেবে চলে আসতে বাধ্য হন। স্বভাবতই এদের অধিকাংশ তীব্র ভারতবিদ্বেষী ছিলেন। তাই পূর্ব পাকিস্তানের পশ্চিমাঞ্চলে বসবাসরত শরণার্থীদের অধিকাংশই মুসলিম লীগের রাজনীতির সঙ্গে মিশে যান। পরবর্তীকালে বাংলাদেশ আওয়ামী লীগের জন্ম হলেও সীমান্তবর্তী অন্যান্য এলাকার মানুষের মত এদের অধিকাংশ আওয়ামী লীগের রাজনীতির সঙ্গে যুক্ত হননি যা ১৯৭১ সাল পর্যন্ত প্রায় একইরকম ছিল। আর ১৯৭১ সালে মুক্তিযুদ্ধের প্রাক্কালে ভারতীয় সীমান্তে অবস্থিত অন্যান্য এলাকার মতো বাগআঁচড়া ইউনিয়নের চেয়ারম্যান ছিলেন একজন মুসলিম লীগ নেতা। ফলে ক্ষমতাসীনদের চ্যালেঞ্জ করে স্থানীয় আওয়ামী লীগের নেতারা পাকিস্তানের নাগপাশ হতে মুক্ত হওয়ার জন্য প্রস্তুত হতে থাকেন। এরূপ প্রেক্ষাপটে বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান ৭ই মার্চ স্বাধীনতার ডাক দিলে,

"ঝিকরগাছা ও শার্শা থানার দক্ষিণ অংশের নেতৃবৃন্দ দুই থানার প্রাণকেন্দ্র বাগআঁচড়ায় প্রতিরোধ কমিটি গঠন করেন যার পুরোভাগে ছিলেন অধ্যাপক জালাল উদ্দিন (শংকরপুর ইউনিয়ন আওয়ামী লীগের সভাপতি), খন্দকার শফিউল হক (শংকরপুর ইউনিয়ন আওয়ামী লীগের সাধারণ সম্পাদক), ইয়াকুব হোসেন বিশ্বাস (বাগআঁচড়া ইউনিয়ন আওয়ামী লীগের সভাপতি),

হাফিজ উদ্দিন (বাগআঁচড়া ইউনিয়ন আওয়ামী লীগের সাধারণ সম্পাদক), মফিজ উদ্দিন বিশ্বাস (বাগআঁচড়া ইউনিয়ন আওয়ামী লীগের অন্যতম নেতা), নবিছউদ্দিন (কায়বা ইউনিয়ন আওয়ামী লীগের সভাপতি), হবিবর রহমান খান (কায়বা ইউনিয়ন আওয়ামী লীগের সাধারণ সম্পাদক) প্রমুখ।"[৯]

আওয়ামী লীগের এরূপ পদক্ষেপের ফলে মুসলিম লীগের নেতাগণও সতর্ক হলেন। তারা সাধারণ জনগণের মধ্যে প্রচার করা শুরু করলেন যে শেখ সাহেব এবং আওয়ামী লীগ পাকিস্তানের বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্র শুরু করেছেন। তারা সাধারণ মানুষকে বিভিন্নভাবে বোঝানোর চেষ্টা করলেন যাতে সাধারণ মানুষ আওয়ামী লীগের নেতাদের কথায় সাড়া না দেয়। কিন্তু হাতেম আলী মাস্টার, মেছের আলী মোল্লা, দিরাজতুল্যা পণ্ডিত প্রমুখের অনুপ্রেরণায় ও স্বাধীনতাকামী জনগণের আর্থিক সাহায্যে স্বাধীন বাংলার পতাকা তৈরি করে স্থানীয় আওয়ামী লীগের কার্যালয়সহ বাগআঁচড়া বাজারের বিভিন্ন দোকানে উত্তোলিত হয় এবং ২৩ মার্চ পাকিস্তান দিবসে বাগআঁচড়া বাজারের কোথাও চাঁদ-তারা খচিত পাকিস্তানের পতাকা উত্তোলিত হয়নি।[১০] **২৬ মার্চ ১৯৭১** সালে চট্টগ্রাম কালুরঘাট বেতার কেন্দ্র থেকে বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের পক্ষ থেকে আওয়ামী লীগ নেতা আব্দুল হান্নান স্বাধীনতার ঘোষণা পাঠ করলে বাগআঁচড়ার মুসলিম লীগ এবং আওয়ামী লীগের নেতৃবৃন্দ তীব্র প্রতিক্রিয়া ব্যক্ত করতে থাকেন। মুসলিম লীগের নেতাগণ তাদের কর্মী ও সমর্থকদের পাকিস্তান বিরোধী ষড়যন্ত্র প্রতিহত করার জন্য প্রস্তুত হতে বলেন এবং মুসলিম লীগের নেতৃবৃন্দ কেন্দ্রীয় নেতাদের নির্দেশনার অপেক্ষায় থাকেন। মুসলিম লীগের নেতাদের মধ্যে উল্লেখযোগ্য ছিলেন চতুরালী মণ্ডল, কফিলউদ্দীন গাজী এবং আব্দুল বারিক মণ্ডল প্রমুখ।[১১] এমতাবস্থায় বাগআঁচড়ায় গঠিত প্রতিরোধ কমিটি সংগ্রাম কমিটিতে রূপান্তরিত হয় এবং এতে যুক্ত হন বাগআঁচড়া ইউনাইটেড মাধ্যমিক বিদ্যালয়ের সহকারী প্রধান শিক্ষক মোঃ আনিসউদ্দিন খান, মাস্টার রফিক আহমেদ (পূর্বকোটা), মাস্টার কওছার আলী (বামুনিয়া) প্রমুখ।[১২] এরূপ পরিস্থিতিতে মুসলিম লীগের শক্ত ঘাঁটি হিসেবে পরিচিত বাগআঁচড়ায় পিস কমিটির সেক্রেটারি হিসেবে আলী হোসেনের নেতৃত্বে পাকিস্তানপন্থীরা সদস্য যোগাড়ের আপ্রাণ চেষ্টা চালিয়ে কিছুটা সফল হন। কায়বা ইউনিয়নের চেয়ারম্যান দেছারত হোসেন এবং বাগআঁচড়ার কমান্ডার বদরউদ্দিনের নেতৃত্বে বাগআঁচড়া, কায়বা এবং শংকরপুর ইউনিয়নের কিছু দরিদ্র ব্যক্তি পাকবাহিনীর পক্ষে কাজ করতে থাকেন।





**বাগআঁচড়া যুদ্ধের প্রেক্ষাপট**

যুদ্ধের প্রাথমিক দিনগুলোতে বাগআঁচড়ার আশেপাশের ইউনিয়নগুলো থেকে আওয়ামী লীগের সমর্থক, কর্মীগণ এবং সাধারণ দেশপ্রেমিক নাগরিকগণ যাতে মুক্তিযুদ্ধে অংশগ্রহণ না করেন সেজন্য পাকবাহিনীর দোসর, আলবদর, রাজাকার এবং আনসাররা দেশে শান্তি প্রতিষ্ঠার নামে এলাকায় ভয়ভীতি প্রদর্শন করে এক ত্রাসের রাজত্ব সৃষ্টি করেন। যশোর ক্যান্টনমেন্ট আক্রমণ, কাগজপুকুরের যুদ্ধে মুক্তিবাহিনী পরাজিত হলে পাকিস্তানি বাহিনী দ্বারা শার্শা উপজেলার সাধারণ মানুষ ব্যাপকভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হন কিন্তু বাগআঁচড়ার আশে-পাশে বড় কোনো হত্যাকাণ্ড সংগঠিত হয়নি।

কিন্তু দক্ষিণ বঙ্গের অন্যতম হিন্দু অধ্যুষিত এলাকা ছিয়ানব্বই গ্রামের (মনিরামপুর, কেশবপুর, অভয়নগর ও ডুমুরিয়া থানার মধ্যবর্তী এলাকায় তাদের বসবাস ছিল) হিন্দু সম্প্রদায়ের মানুষেরা তাদের জানমালের নিরাপত্তার কথা ভেবে উদ্বাস্তু বা শরণার্থী হিসেবে ভারতে পালিয়ে যাওয়ার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেন। এপ্রিল মাস থেকে এ পলায়ন শুরু হলেও মে মাসের প্রথম সপ্তাহে তারা দলে দলে শার্শা থানার দক্ষিণ প্রান্তের বাগআঁচড়া এবং কলারোয়া উপজেলার উত্তর প্রান্তের ইলিশপুর দিয়ে পালানো শুরু করেন। ইতোমধ্যে অত্র এলাকার পাকিস্তানি সহযোগীরা নাভারণে অবস্থিত পাকিস্তানি সেনাক্যাম্পে (নাভারণ ইউনিয়ন কাউন্সিল এলাকায় স্থাপিত) এ সংক্রান্ত পৌঁছে দেয়। এর প্রেক্ষিতে ৪ মে ছিয়ানব্বই গ্রামের এক বিশাল শরণার্থী দল বাগআঁচড়া ও ইলিশপুর দিয়ে ভারতে যাওয়ার সময় পাকসেনার একটি দল এবং পাক মিলিশিয়ারা শরণার্থীদের উপর অত্যন্ত ন্যাক্কারজনক ও বর্বরোচিত হামলা চালায়। এতে অনেক শরণার্থী আহত এবং নিহত হয়।[১৩] পাকবাহিনী এবং পাকিস্তানি সহযোগীরা গরুগাড়ি এবং ট্রাকে করে লুটকৃত মালামাল নিজেরা ব্যক্তিগতভাবে আত্মসাৎ করে এবং নাভারণের পাকসেনাক্যাম্পে নিয়ে যায়।

এপ্রিল মাসের প্রথম থেকে পাকিস্তানি বাহিনী ও এর দোসররা মুক্তিযুদ্ধের ৮নং সেক্টরের দক্ষিণ-পশ্চিম প্রান্তে তাদের অবস্থান জোরদার করে এবং মুক্তিযোদ্ধা ও সাধারণ মানুষের উপর আক্রমণ বৃদ্ধি করতে থাকে। এরই অংশ হিসেবে পাকসেনারা নাভারণ-সাতক্ষীরা রাস্তায় ব্যাপকভাবে টহলদারী করত এবং সুযোগ ও প্রয়োজন অনুযায়ী বিভিন্ন আক্রমণ পরিচালনা করত। **১৯৭১** সালের **১৫** জুলাই বৃহস্পতিবার সকালে কলারোয়া উপজেলার ব্রজাবাক্স বাজারের রাস্তায় পাকসেনাদের একটি

কনভয় অতিক্রম করার সময় কেরালকাতা ইউনিয়নের আওয়ামী লীগ নেতা চাঁদ আলী সরদারের নেতৃত্বে নেতাকর্মীদের একটি দল পাকবাহিনীকে আক্রমণ করে স্থান ত্যাগ করে। ঐদিনই পাকসেনারা কয়েক দফা অভিযান চালিয়ে পার্শ্ববর্তী কয়েকটি গ্রাম থেকে আওয়ামী লীগের অনেক (আনুমানিক ৩০ জন, সঠিক সংখ্যা আজও জানা যায়নি) নেতাকর্মীকে গ্রেফতার করে প্রথমে কলারোয়া থানা, তারপর সাতক্ষীরায় কারাগারে নিয়ে যায়। সেখানে মুক্তিফৌজদের সাহায্য করার অভিযোগে[১৪] তাদের বিচার শুরু হয়। বিচার চলাকালীন তাদেরকে যশোর সেনানিবাসে স্থানান্তর করা হল এবং এরই এক পর্যায়ে পাকসেনা কর্মকর্তাগণ ও থানার কর্মকর্তাগণ উৎকোচ গ্রহণ করে অভিযুক্তদের মুক্তি দিলে তাঁরা নভেম্বরের দ্বিতীয় সপ্তাহে যার যার বাড়িতে ফিরে যান।[১৫] এখানে উল্লেখযোগ্য যে, বাড়ি থেকে গ্রেফতারের পর পাকসেনারা ভুল করে যাঁদেরকে কলারোয়া থানার মাধ্যমে সাতক্ষীরায় প্রেরণ করেছিলেন তাঁরা সেনাদের অত্যাচারে মারাত্মকভাবে আহত বা শারীরিকভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হলেও জানে বেঁচে গিয়েছিলেন। কেননা, ঐদিন প্রথম দফায় গ্রেফতারকৃতদের মধ্যে প্রথম ছয় জনকে পাকসেনারা থানায় না নিয়ে যশোর সেনানিবাসে নেওয়ার পথে বাগআঁচড়া ইউনিয়নের জামতলার নিকটবর্তী সামটা মৌজার দক্ষিণে জামতলা-বাগআঁচড়া রাস্তার পূর্ব পার্শ্বে অত্যন্ত পাশবিকভাবে নির্যাতন করে হত্যা করে মাঠের মধ্যে ফেলে যায়। পরের দিন সামটা গ্রামের কৃষকরা মাঠে গিয়ে তাদের লাশ সমাহিত করেন, আর স্থানটি আজো 'পাঁচ কবর' বা 'পাঁচ মাজার' নামে পরিচিত যা আসলে একটি গণকবর। পাকিস্তানি সেনা এবং তাদের দোসররা এসব দেশপ্রেমিক যোদ্ধাদের প্রথমে গুলি করে এবং পরে বেউনেট দিয়ে খুঁচিয়ে তাঁদের মৃত্যু নিশ্চিত করে। তবে ঐ কবরে যারা শায়িত আছেন তাঁদের মধ্যে ২ জনের[১৬] পরিচয় নিশ্চিত হওয়া গেলেও বাকি ৪ জনের পরিচয় আজও অজানা। তবে গবেষকরা এখনো বাকিদের পরিচয় উদ্‌ঘাটনে অনুসন্ধান অব্যাহত রেখেছেন। উক্ত নৃশংস ঘটনাটি এলাকাবাসীর মনে মারাত্মকভাবে দাগ কাটে। এলাকার আওয়ামী লীগের কর্মী সমর্থকেরা ঘটনাটি বিভিন্নভাবে মুক্তিযোদ্ধাদের অবহিত করার চেষ্টা করেন। কিন্তু বাগআঁচড়া ও এতদসংলগ্ন এলাকার মুক্তিযোদ্ধাগণ দেশের অন্যান্য এলাকায় অবস্থান করায় তারা কলারোয়া উপজেলার গয়ড়া এবং চন্দনপুর ক্যাম্পে (অনেকটা মুক্ত এলাকার মত) অবস্থানকারী মুক্তিযোদ্ধাদের অবহিত করেন। ফলে ঐ এলাকার মুক্তিযোদ্ধারা মনে করলেন যে, পাকসেনাদের পক্ষে বেছে বেছে





আওয়ামী লীগের কর্মীদের গ্রেফতার করা সম্ভব নয়, নিশ্চিতভাবে এর পেছনে স্থানীয় রাজাকার, আলবদর, আলশামস ও পিস কমিটির সদস্যদের হাত রয়েছে। তাই চন্দনপুর হাই স্কুলে ক্যাম্প স্থাপনের পর সুযোগ বুঝে তাঁরা বাগআঁচড়া বাজারে স্থাপিত পাক মিলিশিয়াদের ঘাঁটি আক্রমণ করে তাদের শায়েস্তা করার সুযোগ খুঁজছিলেন।

শান্তি কমিটি এবং পাকবাহিনীর সহযোগীদের কার্যকলাপে অতিষ্ঠ হয়ে মুক্তিযোদ্ধাদের একটি ছোট দল ১৯৭১ সালের ১৭ আগস্ট বাগআঁচড়া জে.এম.সি-এর পাটের গুদাম পুড়িয়ে দিলে ১৮ আগস্ট সকালে পিস কমিটির সেক্রেটারি আলী হোসেনের নির্দেশে রাজাকাররা শংকরপুর ইউনিয়ন আওয়ামী লীগের সভাপতি জালাল উদ্দিনের গ্রামের বাড়ি ছোট পোদাউলিয়া ঘেরাও করে তাঁর ছোট ভাই ঝিকরগাছা কলেজের দ্বাদশ শ্রেণির ছাত্র এস. এম. কামাল উদ্দিনকে ধরে নিয়ে যায়।[১৭]

কলারোয়া উপজেলার কেরালকাতা ইউনিয়নের ইলিশপুরে রাজাকারদের একটি ক্যাম্প ছিল যেখানে কিসমত ইলিশপুর, পুটুনি, দরবাসা, ফাজিলকাটি, রতনপুর, ভীখালী, কোমরপুর, সাতপোতা, বেড়বাড়ি এবং সিংগা গ্রামের রাজাকাররা (তাদের মধ্যে উল্লেখযোগ্য ছিল: আফিল উদ্দিন, আব্দুল মান্নান, আব্দুল কাদের, রফিকুল ইসলাম ও নূর মোহাম্মদ) অবস্থান করে এলাকার সাধারণ মানুষের উপর অত্যাচার করে সম্পদ দখল করত। সেপ্টেম্বরের শেষ সপ্তাহে স্থানীয় রাজাকাররা ভারী অস্ত্র নিয়ে কেরালকাতা ইউনিয়ন কাউন্সিলে অবস্থান নিলে ইলিশপুরের মুক্তিযোদ্ধা মোঃ গোলাম মোস্তফার পিতা মুনছুর আলি সরদার এবং নবু সরদার চন্দনপুর হাই স্কুলে অবস্থানরত মুক্তিসেনাদের ক্যাম্পকে (৩টি ইউনিট সেখানে অবস্থান করছিল) অবহিত করেন। তখন কমান্ডার আব্দুল গফফারের নেতৃত্বে মুক্তিযোদ্ধাদের ১৮ সদস্যের একটি দল (৩টি ইউনিট থেকে নির্বাচিত সদস্যদের নিয়ে দলটি গঠিত হয়েছিল) তাদের উপর আক্রমণ করার প্রস্তুতি নিয়ে কেরালকাতা ইউনিয়ন পরিষদের পশ্চিম পাশের বিলে অবস্থান গ্রহণ করেন। মুক্তিযোদ্ধাদের উপস্থিতি টের পেয়ে রাজাকাররা পরিষদ ভবনের মধ্যে অবস্থান নেয়। তাদের সঙ্গে জোর করে ধরে আনা স্থানীয় কয়েকজন নিরীহ মানুষও ছিলেন।[১৮] কমান্ডার আব্দুল গফফার ফায়ার ওপেন করলে উভয়পক্ষে ব্যাপক গোলাগুলি হয় এবং একপর্যায়ে রাজাকারদের কয়েকজন পালিয়ে যায় এবং মুক্তিযোদ্ধারা তাদের ৫ জনকে গ্রেফতার করে প্রথমে ক্যাম্পে নিয়ে রাখেন এবং পরবর্তীকালে হাকিমপুর

সাব-সেক্টরে প্রেরণ করেন। তাদের প্রায় সকলেই মুক্তিযোদ্ধাদের এলাকার এবং পরস্পরের পরিচিত হওয়ায় কিছুদিন পরে তাদের সকলেই মুক্তি লাভ করে।[১৯]

বাগআঁচড়া তিন থানার সঙ্গমস্থল হওয়ায় পাকবাহিনী এবং এর সহযোগীদের কাছে স্থানটি খুবই গুরুত্বপূর্ণ ছিল। আর সে কারণে যশোর-সাতক্ষীরা (ভায়া নাভারণ) রোডের বাগআঁচড়া বাজারের উত্তর পাশে অবস্থিত বাগআঁচড়া ইউনাইটেড মাধ্যমিক বিদ্যালয় সংলগ্ন পোস্ট অফিসে আনসার, রাজাকার, আলবদর ও আলশামস সম্মিলিতভাবে একটি ক্যাম্প স্থাপন করে। পাকিস্তানি সামরিক বাহিনীর অফিসাররা সপ্তাহান্তে একবার ক্যাম্পটি পরিদর্শন করে প্রয়োজনীয় লজিস্টিক সাপোর্ট ও দিকনির্দেশনা প্রদান করত। মজার ব্যাপার হলো পাকবাহিনীর স্থানীয় সহযোগীরা এখানে খুবই কম অবস্থান করত। তাদের কেউ কেউ রাতের বেলা সংগোপনে আসত এবং প্রয়োজনীয় তথ্য-উপাত্ত আদান-প্রদান করে আবার চলে যেতো। যশোর বা দেশের অন্যান্য অঞ্চলের আনসার, রাজাকার, আলবদর ও আলশামস সদস্যরা এই ক্যাম্পে অবস্থান করে এলাকায় এক ভীতিকর পরিবেশ তৈরি করত। তারা কলেজ রোডে (বাগআঁচড়া টু কায়বা ও গয়ড়া জিসি সড়ক) অবস্থিত বর্তমানে সাত্তার মিয়ার বাড়ির (১৯৭১ সালে ঐ স্থানে একজন হিন্দুর বাড়ি ছিল যা মুচি বাড়ি নামে পরিচিত ছিল) দক্ষিণ-পূর্ব কোণ দিয়ে যে রাস্তাটি বাগআঁচড়া বাজারে ঢুকেছে সেই মোড়ে ব্যারিকেড দিয়ে রাখত। বাঁশের যে লাঠি ব্যারিকেড দিতে ব্যবহৃত হত তাকে হুড়কো বলা হত। প্রতিটি ব্যক্তিকে তল্লাশি করে সেই ব্যারিকেড পার হতে হত। আর কারো প্রতি সন্দেহ হলে তাকে গ্রেফতার করে নির্যাতন করা হত। এর মধ্যে ছিল শারীরিকভাবে লাঞ্ছিতকরণ, বেদম প্রহার, মর্চে বা বাঙ্কার খোঁড়ানো এবং কাছে থাকা অর্থ সম্পদ লুটকরণ।[২০] সবচেয়ে পরিতাপের বিষয় ছিল কোনো ব্যক্তি যদি ইলিশ মাছ (তখনকার বাজারের সবচেয়ে সস্তা মাছ) ক্রয় করে নিয়ে যেত তাহলে তারা সেই মাছের পাছা কেটে রাখত অথবা চিরে দিত। পাকিস্তানি সহযোগীদের যুক্তি ছিল যে, এই মাছ ভারতে পাচার হয়ে যাবে কিন্তু পাছা কেটে দিলে সেই মাছ আর ভারত নিবে না। তাদের মতে, দেশের লোকই মাছ পায় না, ভারতের লোক কেন ইলিশ মাছ খাবে। কিন্তু তারা একবারের জন্য ভাবতো না, যে লোকটি মাছ নিয়ে যাচ্ছে তিনি চোরা কারবারের সঙ্গে জড়িত না সাধারণ লোক। প্রকৃতপক্ষে এগুলো ছিল তাদের খোঁড়া যুক্তি, মানুষকে হয়রানি করার জন্য এতকিছু করত তারা। মজার ব্যাপার হলো এসব কাজে পাকিস্তানি সহযোগীদের মধ্যে





স্থানীয়রা সক্রিয় অংশগ্রহণ করত না, বরঞ্চ বাইরে থেকে আসা সহযোগীরা অত্যন্ত উৎসাহের সাথে এসব কাজ করতো। এদের মধ্যে উল্লেখযোগ্য ছিল কিসমত, রওশন (আদি বাড়ি সাতক্ষীরার শ্যামনগর), হেরামত, কেরামত (বাড়ি নাভারণ), এদের নেতৃত্ব দিত বসতপুরের কাদের গোলদার (তার পদবি ছিল জিসিও বা জেনারেল কমান্ডিং অফিসার)। আর পুরো বিষয়ের দেখভাল করতো বাগআঁচড়া পিস কমিটির সেক্রেটারি আলী হোসেন।[২১]

পাকবাহিনীর পৃষ্ঠপোষকতায় বাগআঁচড়া ইউনিয়ন পিস কমিটির নেতৃত্বে রাজাকার এবং আলবদর বাহিনীর একটি ছোট দল মুক্তিযোদ্ধাদের শক্তি পরীক্ষা করার জন্য 'বেলেখাল' নামক স্থানে যুদ্ধে অবতীর্ণ হয়। প্রায় ঘণ্টাব্যাপী এ যুদ্ধে পাকবাহিনীর দোসররা সম্পূর্ণভাবে পরাস্ত হয়ে বাগআঁচড়া এলাকায় পালিয়ে যায়। রাজাকার কমান্ডার বদরউদ্দিন, বদরের চাচাতো ভাই আনোয়ার হোসেন এবং নাভারণে স্থাপিত রাজাকার ক্যাম্প থেকে আসা নাম না জানা আরো ৭/৮ জন পাক মিলিশিয়াদের পক্ষে অংশগ্রহণ করে। অন্যদিকে কমান্ডার আব্দুল গফফারের নেতৃত্বে মুক্তিযোদ্ধারা এ যুদ্ধে বীরত্বের পরিচয় দেন। এ প্রসঙ্গে গ্রুপ কমান্ডার গবেষককে জানিয়েছেন, "আমরা ব্যাপক পরিসরে ফায়ার শুরু করলে ওরা আস্তে আস্তে পজিশন ছেড়ে দিয়ে সরে পড়ে।"[২২] উভয় পক্ষের সদস্যরা থ্রি নট থ্রি এবং এলএমজি ব্যবহার করে। ঠিক কত তারিখে এ যুদ্ধ সংঘটিত হয় অংশগ্রহণকারী মুক্তিযোদ্ধারা বলতে পারেননি। এ প্রসঙ্গে একজন বলেন, "বালিয়াডাঙ্গা যুদ্ধের পর আমরা চন্দনপুর হাই স্কুলে ঘাঁটি গাড়ি। আর এর কয়েকদিন পরে এই যুদ্ধ হয়। আমার মনে পড়ে পাট গাছ তখন মানুষ ছাড়া হয়ে গেছে।"[২৩] সুতরাং অনুমান করা কঠিন নয় যে, অক্টোবরের প্রথম সপ্তাহের কোনো একদিন এই যুদ্ধ হয়েছিল। প্রশ্ন হলো, বাগআঁচড়া থেকে ৬ কিলোমিটার দূরে বেলেখালে এসে রাজাকার-আলবদররা কেনো যুদ্ধ করতে আগ্রহী ছিল। উত্তরটা খুব সোজা, এলাকাটি কৌশলগত দিক বিবেচনায় বেশ স্পর্শকাতর। কেননা, এর উত্তরে ফাজিলকাটি, দক্ষিণে কাজিরহাট বাজার এবং নাকিলা গ্রাম এবং সোজা পশ্চিমে কাঁচা রাস্তা ধরে এগুলে দরবাশা গ্রাম। কাতলামারী বিলের পানি বেলেখাল দিয়ে ধানঘোরা পার হয়ে বেতনা নদীতে গিয়ে পড়ে। ফলে এখানে যুদ্ধ হলে পাক মিলিশিয়ারা সহজে পালাতে পারবে সম্ভবত এমন চিন্তা তাদেরকে এই যুদ্ধে উৎসাহিত করে। এছাড়া রাজাকারদের কাছে খবর ছিল যে, বাগআঁচড়া আক্রমণের জন্য যেসব মুক্তিযোদ্ধা প্রস্তুতি নিচ্ছেন তাদের বাড়ি কেরালকাতা ইউনিয়ন বা এতদসংলগ্ন এলাকায় যা বেলেখালের নিকটবর্তী।

## বাগআঁচড়া যুদ্ধঃ অংশগ্রহণকারী এবং এতদসংশ্লিষ্ট ঘটনাবলি

এমনি অবস্থায় বাগআঁচড়া এবং এতদসংলগ্ন এলাকার মানুষের মুক্তি এবং নাভারণ-সাতক্ষীরা রাস্তার পশ্চিম পাশে যেন পাকিস্তানি বাহিনী প্রবেশ করতে না পারে সেটি নিশ্চিত করা অপরিহার্য হয়ে ওঠে। অবশেষে হাকিমপুরের সাব-সেক্টর কমান্ডার ক্যাপ্টেন সফিকউল্যার নির্দেশে ইয়ুথ ক্যাম্প থেকে প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত গেরিলাদের একটি দল চন্দনপুর হাই স্কুলে ক্যাম্প স্থাপন করে এবং যুদ্ধের জন্য প্রস্তুতি গ্রহণ করতে লাগলেন।[২৪] এই দলের কমান্ডারবৃন্দ স্থানীয় মানুষদের সম্পৃক্ততা নিশ্চিত করতে নানামুখি উদ্যোগ গ্রহণ করেন।[২৫] প্রথমত, তাঁরা লজিং এর মতো করে এক একজন মুক্তিযোদ্ধাকে একেক জন ব্যক্তির বাড়িতে খাওয়ার ব্যবস্থা করলেন। স্থানীয় ব্যক্তিরা স্কুলের ক্যাম্পে তাদের সামর্থ্য অনুযায়ী খাবার পৌঁছে দেওয়ার ব্যবস্থা করতেন। স্থানীয় মানুষের মধ্যে যারা তাদের নিত্য প্রয়োজনীয় ও অন্যান্য জিনিসপত্র ক্রয়-বিক্রয়ের জন্য বাগআঁচড়া বাজারে যেতেন তারা মুক্তিযোদ্ধাদের ঐ ক্যাম্পে যেয়ে রাজাকার, আলশামস, আলবদর এবং অন্যান্য মিলিশিয়াদের অত্যাচার-নির্যাতনের ধরন ও তাদের পরিকল্পনা ও গতিবিধি সম্পর্কে মুক্তিযোদ্ধাদের অবহিত করতেন। বাগআঁচড়া বাজারের উত্তর পশ্চিম ও দক্ষিণ পশ্চিম পাশের গ্রামগুলোর মানুষেরা আগ্রহভরে পাকিস্তানি সহযোগীদের অত্যাচার নির্যাতন থেকে মুক্তির জন্য অধীর আগ্রহে অপেক্ষা করছিলেন। তাই চন্দনপুর হাই স্কুলে স্থাপিত ক্যাম্পের মুক্তিযোদ্ধাদের সব রকমের সহায়তা দিতে তারা পুরোপুরি প্রস্তুত ছিলেন। আর স্থানীয় জনগণের সম্পৃক্ততার এ কাজে নেতৃত্ব দিয়েছিলেন গয়ড়ার বীর মুক্তিযোদ্ধা আহম্মদ হোসেন খান যিনি পেশায় পল্লী চিকিৎসক ছিলেন। তিনি অসীম সাহসী এবং বঙ্গবন্ধুর ভক্ত বলে এলাকাবাসী জানেন। অন্য আরেকজন ছিলেন বয়ারডাঙ্গার হযরত মেম্বার। এই দুইজনের প্রচেষ্টায় চন্দনপুর ইউনিয়নের গোয়ালপাড়া, চান্দুড়িয়া, কাদপুর, গয়ড়া, চন্দনপুর, সুলতানপুর, হিজলদী, রামভদ্রপুর, বয়ারডাঙ্গা, বিক্রমপুর, দাড়কী, নাথপুর, মদনপুর এবং কায়বা ইউনিয়নের রুদ্রপুর, ভবানীপুর-দাদখালি, কায়বা, পাঁচ কায়বা, বাইকোলা, চালিতাবাড়িয়া এবং পশ্চিমকোটার মানুষজন ব্যাপকভাবে মুক্তিযোদ্ধাদের বিভিন্নভাবে সাহায্য-সহযোগিতা করেন। এরকম পরিস্থিতিতে, একদিকে পাকবাহিনী ও মিলিশিয়াদের পরাজিত করার তীব্র বাসনা এবং এলাকাবাসীর উৎসাহ ও অনুপ্রেরণা অন্যদিকে পাক সহযোগীদের চরম উদ্ধত্য ও সীমাহীন অত্যাচার মুক্তিযোদ্ধাদের ধৈর্য্যচ্যুতি ঘটায়। তখন উপরি-উল্লিখিত ক্যাম্পে অবস্থানকারী তিন কমান্ডার গোপন





মিটিংয়ে বাগআঁচড়ায় অবস্থিত পাকসেনা ও এর সহযোগী মিলিশিয়াদের ঘাঁটি আক্রমণের সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেন। সিদ্ধান্ত অনুযায়ী, গ্রুপের সবচেয়ে সাহসী যোদ্ধা ও খানিকটা বেপরোয়া চান্দার মোঃ সওকত আলীকে বাগআঁচড়া রেকি করতে পাঠানো হয়। তিনি দায়িত্ব যথাযথভাবে পালন করে ক্যাম্পে রিপোর্ট করলেন যে, "আজ (২০ অক্টোবর) রাতে পাকসেনাদের একটি চৌকস দল বাগআঁচড়ায় অবস্থিত আনসার, আলবদর ও রাজাকারদের ঘাঁটি পরিদর্শন করবে, প্রয়োজনীয় নির্দেশনা দিবে এবং এজন্য তারা সেখানে রাতে অবস্থান করবে।"[২৬]

সওকতের নিকট থেকে তথ্য পেয়ে তিন কমান্ডার গোপনে চূড়ান্ত মিটিং করে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করলেন যে, যুদ্ধে যেতে হবে। সন্ধ্যার দিকে ছেলেদের ডেকে তাঁরা জানালেন যে, আজ (২০ অক্টোবর) রাতে যুদ্ধে যেতে হবে। "আসলে ছেলেরা যুদ্ধের জন্য উদগ্রীব ছিল। তাঁরা অতি অল্প সময়ে পুরো প্রস্তুতি গ্রহণ করলেন এবং গুরুত্বপূর্ণ বিষয়টি হলো তাঁদের কেউ কোথায় যুদ্ধ হবে বা কোথায় যেতে হবে এমন সাধারণ একটি প্রশ্নও করলেন না। ছেলেরা আনন্দিত হলো। সব মিলিয়ে হলো ৬৪ জন, মানে মুক্তিযোদ্ধা এবং পাবলিক মিলিয়ে। পাবলিকের মধ্যে উল্লেখযোগ্য ছিলেন কায়বার শের আলী মেম্বার এবং বিক্রমপুরের (পরবর্তীকালে গয়ড়া) ইসহাক মোড়ল। এঁরা যুদ্ধের মালামাল বয়ে নেওয়ার জন্য স্থানীয় ২০/৩০ লোক জোগাড় করে দিলেন যারা অস্ত্রধারী নয়। তারা আরো বললেন, 'তোমরা মুক্তিযোদ্ধাদের সাথে যাও'।"[২৭] নিম্নে অংশগ্রহণকারীদের যে তালিকা দেওয়া হলো সেখানে মুক্তিযোদ্ধাদের নাম উল্লেখ করা হয়েছে, তারপরও কেউ কেউ তালিকা থেকে বাদ পড়েছেন।

### প্রথম দল

| ক্র. নং | মুক্তিযোদ্ধার নাম | পিতার নাম | গ্রাম | পোস্ট অফিস/ ইউনিয়ন/ পৌরসভা | উপজেলা ও জেলা |
|---|---|---|---|---|---|
| ০১ | মোঃ মোসলেম উদ্দীন (কমান্ডার) | মৃত মাদার সরদার | তুলসীডাঙ্গা | কলারোয়া | কলারোয়া, সাতক্ষীরা |
| ০২ | মোঃ আঃ জব্বার শেখ | মৃত খলিল সানা | বৈদ্যপুর | বামনখালি | ঐ |
| ০৩ | মোঃ শওকত আলি শেখ | মৃত খলিল সানা | বৈদ্যপুর | বামনখালি | ঐ |

| ক্র. নং | মুক্তিযোদ্ধার নাম | পিতার নাম | গ্রাম | পোস্ট অফিস/ ইউনিয়ন/ পৌরসভা | উপজেলা ও জেলা |
|---|---|---|---|---|---|
| ০৪ | মোঃ আব্দুর রউফ | মোঃ জেহের আলি সানা | কয়লা | মুরারীকাটি | ঐ |
| ০৫ | মৃত হরনাথ ঘোষ | মৃত কালিপদ ঘোষ | কেঁড়াগাছি | কেঁড়াগাছি | ঐ |
| ০৬ | শ্রী চিত্তরঞ্জন বিশ্বাস | মৃত রামপদ বিশ্বাস | কেঁড়াগাছি | কেঁড়াগাছি | ঐ |
| ০৭ | মোঃ জাহাঙ্গীর আলম | মৃত ইয়াকুব আলী সরদার | মদনপুর | চন্দনপুর | ঐ |
| ০৮ | মোঃ গোলাম মোস্তফা | মৃত মুনছুর আলি সরদার | ইলিশপুর | কেরালকাতা | ঐ |
| ০৯ | মোঃ লুৎফর রহমান | মৃত কেরামত মন্ডল | ইলিশপুর | কেরালকাতা | ঐ |
| ১০ | মৃত রবিউল হক | মৃত সৈয়দ আলি দালাল | কাকডাঙ্গা | কেঁড়াগাছি | ঐ |
| ১১ | মোঃ ছাকার উদ্দীন | মৃত মনিত উদ্দীন গাজী | বলিয়ানপুর | কেরালকাতা | ঐ |
| ১২ | মৃত অজিহার রহমান | মৃত আঃ বারিক সানা | হুলহুলিয়া | কেরালকাতা | ঐ |
| ১৩ | শ্রী কার্তিক চন্দ্র সরকার | মৃত অশ্বীনী কুমার সরকার | বোয়ালিয়া | বোয়ালিয়া | ঐ |
| ১৪ | মোঃ আব্দুর রউফ | মৃত রুহুল আমিন সরদার | রামভদ্রপুর | চন্দনপুর | |

## দ্বিতীয় দল

| ক্র. নং | মুক্তিযোদ্ধার নাম | পিতার নাম | গ্রাম | পোস্ট অফিস/ইউনিয়ন /পৌরসভা | উপজেলা ও জেলা |
|---|---|---|---|---|---|
| ০১ | মোঃ আব্দুল গফফার (কমান্ডার) | মৃত তছির উদ্দিন গাজী | বহুড়া | সোনাবাড়িয়া | কলারোয়া, সাতক্ষীরা |
| ০২ | তৈয়ব উদ্দিন আহম্মদ | মৃত ডাঃ ময়েজ উদ্দিন আহম্মদ | চালিতাবাড়িয়া | কায়বা | শার্শা |
| ০৩ | মোঃ আমজের আলী | মৃত আমিনদ্দীন গাজী | সুলতানপুর | হিজালদী | কলারোয়া, সাতক্ষীরা |



| ক্র. নং | মুক্তিযোদ্ধার নাম | পিতার নাম | গ্রাম | পোস্ট অফিস/ইউনিয়ন /পৌরসভা | উপজেলা ও জেলা |
|---|---|---|---|---|---|
| ০৪ | মোঃ হযরত আলি | মৃত ভোলাই সরদার | চান্দুড়িয়া | চান্দুড়িয়া | ঐ |
| ০৫ | মোঃ নুর হোসেন | মৃত অহেদ আলী সরদার | কাদপুর | চন্দনপুর | ঐ |
| ০৬ | শাজাহান আলি | মৃত ওয়াজেদ আলি | কাকডাঙ্গা | কেঁড়াগাছি | ঐ |
| ০৭ | এ জেড নজরুল ইসলাম | মৃত আজিজুর রহমান | বোয়ালিয়া | বোয়ালিয়া | ঐ |
| ০৮ | গোলাম রাব্বানী | মৃত হচেন গাজী | খোরদো | খোরদো | ঐ |
| ০৯ | মোঃ আশরাফ আলি | মৃত আফছার আলি | কেঁড়াগাছি | কেঁড়াগাছি | ঐ |
| ১০ | ওমর আলী | মৃত হকির গাজী | কাউরিয়া | কেরালকাতা | ঐ |
| ১১ | মোঃ ইমাম আলি | মৃত সিরাজ সরদার | সুলতানপুর | হিজালদী | ঐ |
| ১২ | মোঃ সুরোত আলি | মৃত সুকচাঁদ সরদার | কাদপুর | চান্দুড়িয়া | ঐ |
| ১৩ | মোঃ আলতাফ হোসেন | মৃত সৈয়দ আলী দালাল | বাগাডাঙ্গা | কেঁড়াগাছি | ঐ |
| ১৪ | মোঃ রফিকুল ইসলাম | মৃত আঃ রহমান | সুলতানপুর | চন্দনপুর | ঐ |
| ১৫ | মোঃ আঃ রাজ্জাক | মৃত বাল্লাক চাঁদ মোড়ল | বাটরা | জালালাবাদ | ঐ |

## তৃতীয় দল

| ক্র. নং | মুক্তিযোদ্ধার নাম | পিতার নাম | গ্রাম | পোস্ট অফিস/ইউনিয়ন /পৌরসভা | উপজেলা ও জেলা |
|---|---|---|---|---|---|
| ০১ | আবু বকর সিদ্দিক (কমান্ডার) | মৃত আঃ ছোবহান গাজী | হাজীপুর | ঝাউডাঙ্গা | সাতক্ষীরা সদর, সাতক্ষীরা |
| ০২ | মোঃ আবুল হোসেন গাজী | মৃত আফিল উদ্দীন গাজী | পারিখুপী | হেলাতলা | কলারোয়া, সাতক্ষীরা |
| ০৩ | মোঃ এবাদুল্যাহ | মৃত মহর আলী গাজী | খোরদো | খোরদো | ঐ |
| ০৪ | মোঃ আব্দুল বারীক | মৃত আনছার আলী | খোরদো | খোরদো | ঐ |

| ক্র. নং | মুক্তিযোদ্ধার নাম | পিতার নাম | গ্রাম | পোস্ট অফিস/ইউনিয়ন /পৌরসভা | উপজেলা ও জেলা |
|---|---|---|---|---|---|
| ০৫ | মোঃ ময়নদ্দীন গাজী | মৃত খোদাবকস গাজী | গয়ড়া | চন্দনপুর | ঐ |
| ০৬ | মোঃ মোহরালী মিস্ত্রী | মৃত বাছতুল্যা মিস্ত্রী | সুলতানপুর | হিজালদী | ঐ |
| ০৭ | মোঃ বাহাদুর বিশ্বাস | মৃত বাদল বিশ্বাস | সুলতানপুর | চন্দনপুর | ঐ |
| ০৮ | সন্তোষ কুমার দাস | মৃত ভবানীচরণ দাস | কুশখালী | কুশখালী | সাতক্ষীরা সদর, সাতক্ষীরা |
| ০৯ | মোঃ নজিবর রহমান | মৃত জাফর আলী গাজী | খোরদো | খোরদো | কলারোয়া, সাতক্ষীরা |
| ১০ | মোঃ মজিবুর রহমান | মৃত মফিজ উদ্দীন মোড়ল | চান্দুড়িয়া | চন্দনপুর | ঐ |
| ১১ | মোঃ শওকত আলী | মৃত ভোলাই সরদার | ঝিকরা | কলারোয়া | ঐ |
| ১২ | মোঃ সওকত আলি | মৃত বরফতুল্যা সরদার | চান্দা | সোনাবাড়ীয়া | ঐ |
| ১৩ | মোঃ সাবেদ আলি | মৃত মঙ্গল দফাদার | বৈদ্যপুর | বামনখালি | ঐ |
| ১৪ | মোঃ আবু দাউদ আলী সরদার | মোঃ আইয়ুব আলী সরদার | ভাদিয়ালী | সোনাবাড়ীয়া | ঐ |
| ১৫ | আবুল হোসেন আলম | মৃত আয়ুব আলী দালাল | ভাদিয়ালী | সোনাবাড়ীয়া | ঐ |

দিনটি ছিল সম্ভবত অক্টোবরের শেষার্ধের কোনো এক বুধবার। আসলে যুদ্ধে অংশগ্রহণকারীদের কেউই নির্দিষ্ট তারিখ বলতে পারেননি। এর কারণ হলো, যাঁরা বাগআঁচড়া যুদ্ধে অংশগ্রহণ করেছিলেন তাদের সবাই দেশমাতৃকার জন্য লড়েছেন; কেউ তারিখ মনে রাখার প্রয়োজন মনে করেননি বা হয়তো ভাবেনওনি এই যুদ্ধের ঘটনা কোনদিন লেখা হতে পারে। দিনটি সম্পর্কে গবেষক বারংবার জিজ্ঞেস করলে তাঁদের কেউ কেউ বলেছেন, তখন অল্প অল্প শীত পড়তে শুরু করেছে। আবার কেউ কেউ অভিযান পথের বর্ণনায় সেই দিন গ্রামের রাস্তার পাশে অবস্থিত বাড়ির উঠানে আখ মাড়াই করে গুড় তৈরি করতে দেখেছেন বলে উল্লেখ করেছেন। তবে ঐ যুদ্ধে নেতৃত্বদানকারী (এখনো জীবিত) একজন কমান্ডার গবেষককে জানিয়েছেন দিনটি ছিল সম্ভবত অক্টোবরের ২০ তারিখ, অর্থাৎ ২০ তারিখের রাত থেকে ২১ তারিখ সকাল পর্যন্ত।





চন্দনপুর ক্যাম্প থেকে মুক্তিযোদ্ধা এবং স্থানীয় সহযোগী মিলে ৬৪ জনের দলটি রাতের খাবার গ্রহণের পর রওয়ানা হলো। ১৯৭১ সালে যে রাস্তা ছিল সেটি এখনকার মতো ছিল না, বাগআঁচড়া থেকে রাড়ি পুকুরের ময়নার বটতলা পর্যন্ত ইটের সোলিং আর চন্দনপুর পর্যন্ত পুরোটাই কাঁচা রাস্তা। চন্দনপুর থেকে বাগআঁচড়া পর্যন্ত পুরো রাস্তাটা আবারো রেকি করেছিলেন চান্দার সওকত আলী। বাগআঁচড়া বাজারের পশ্চিম প্রান্তের গুরুত্বপূর্ণ স্থানটি ছিল রাড়ি পুকুরের ময়নার বটতলা।[২৮] সেখানে বসে আবারো সংক্ষিপ্ত মিটিং শেষে কমান্ডারবৃন্দ চূড়ান্ত সিদ্ধান্তে উপনীত হলেন যে, ৩টি গ্রুপে বিভক্ত হয়ে অভিযানটি পরিচালনা করতে হবে। মোসলেম কমান্ডারের নেতৃত্বে প্রথম দলটি মুচি পাড়ার ভেতর দিয়ে 'মোস্তাজ ডাক্তারের'[২৯] বাড়ির সামনে সাতক্ষীরা-নাভারণ সড়কের পশ্চিম পাশে অবস্থান নিল। অবশ্য ঐ দলে থাকা কোন কোন সদস্য বলেছেন যে, আসলে মুচি পাড়ার ভেতর দিয়ে নয়, রাড়ি পুকুরের ভেতর দিয়ে তারা মোস্তাজ ডাক্তারের বাড়ির উল্টোদিকে (বেলতলা টু সোনাবাড়িয়া ঢোকার রাস্তার ঠিক উত্তর-পূর্ব কোণায়) অবস্থান গ্রহণ করেছিলেন। এখানে অবস্থান নেওয়ার প্রধান কারণ ছিল দক্ষিণ দিক থেকে যদি কোন পাকসেনা কনভয় আসে, তাহলে সহজে যেনো সেটি প্রতিরোধ করা যায়। কমান্ডার আব্দুল গফফারের নেতৃত্বাধীন দ্বিতীয় দলটি ময়নার বটতলা থেকে 'শকুনী বটতলা'[৩০] হয়ে বাগআঁচড়া বাজারের বাগআঁচড়া টু কায়বা রাস্তার মোড়ে অবস্থিত জুট মার্কেটিং কর্পোরেশন (জেএমসি)[৩১]-এর গোডাউনের পশ্চিম কোণায় অবস্থান নেয়। আর তৃতীয় দলটি অবস্থান নেয় ডাক্তার আফিল উদ্দীন-এর বাড়ির সামনে যার নেতৃত্বে ছিলেন কমান্ডার আবু বকর সিদ্দিক। মুক্তিবাহিনীর অবস্থান ও প্রস্তুতি নিতে নিতে রাত প্রায় বারোটা বেজে যায়।

সিদ্ধান্ত ছিল রাত ঠিক একটার সময় কমান্ডার গফফার সর্টগানের ফায়ারিং-এর মাধ্যমে যুদ্ধ শুরু করবেন। এরপর সবাই তাঁকে অনুসরণ করে যুদ্ধে সক্রিয় হবেন। কিন্তু রাত বারোটা এক মিনিটের সময় কমান্ডার গফফার ফায়ার ওপেন করলে তিনটি দলের অবস্থান থেকে মুক্তিযোদ্ধাদের অস্ত্রগুলো (প্রধানত থ্রি নট থ্রি, এলএমজি, হ্যান্ড গ্রেনেড, মোলটভ ককটেইল প্রভৃতি) প্রচণ্ড বেগে গর্জন করতে শুরু করে। ১৯৭১ সালের ঐ সময়টাতে বাংলাদেশের গ্রামগুলোতে শীত পড়তে শুরু করেছিল। রাতের স্তব্ধতা ভেঙ্গে দেশপ্রেমিক যোদ্ধাদের রাইফেলগুলোর গর্জন আব্দুল হামিদের (তার পিতার নাম দবির উদ্দীন সরদার, গ্রাম ভবানীপুর, ইউনিয়নঃ কায়বা;

রাজাকাররা তার গোডাউন দখল করে রেখেছিল) গোডাউনে অবস্থানরত রাজাকার, আলবদর ও আলশামস-এর সদস্য তথা পাক মিলিশিয়াদের ভীত বিহ্বল করে তোলে। তারাও পাল্টা গুলি ছুড়তে শুরু করে। দুপক্ষের গোলাগুলিতে বাগআঁচড়ার আকাশ-বাতাস প্রকম্পিত হতে থাকে। এরই মধ্যে পাক মিলিশিয়া প্রাথমিক সফলতা লাভ করে। কমান্ডার গফফার বাটরার মোঃ আঃ রাজ্জাক-এর কাছে থাকা একটি 'মোলোটভ ককটেইল'[৩২] নিয়ে জেএমসি'র পাটগুদামে নিক্ষেপ করার জন্য উদ্যোত হলে বসতপুরের এলাহী বক্স[৩৩] এসে বললেন, 'ভাই এটা আমাকে দেন আমি মারব' বলেই কমান্ডারের নিকট থেকে এক প্রকার জোর করে নিয়ে সেটি নিক্ষেপ করলেন। কিন্তু সেটি ব্লাস্ট না হয়ে জেএমসি'র দেয়ালে লাগলে জেএমসি'র গোডাউনে দাউ দাউ করে আগুন জ্বলে উঠলো। এর ফলে সমগ্র এলাকা আলোকিত হয়ে উঠলো, আর মুক্তিযোদ্ধাদের অবস্থান হামিদের গোডাউনে থাকা পাক মিলিশিয়ারা দেখে ফেললো এবং মুক্তিযোদ্ধাদের উপর তীব্র বেগে গুলিবর্ষণ করতে লাগল। হঠাৎ একটি বুলেট এসে সুলতানপুরের মোঃ আমজের আলীর বক্ষের ডান পাশ বিদীর্ণ করে বাইরে বের হয়ে ১নং কলোনীর (এলাকায় গ্রামটি বড় কলোনী নামে সমধিক পরিচিত, এটি শার্শা উপজেলার বাগআঁচড়া ইউনিয়নের একটি গ্রাম) এলাইহি বক্স এর মুখের ডান পাশে ঢুকে গেল। প্রচণ্ড আঘাত, ব্যাথা এবং রক্তক্ষরণে তিনি তৎক্ষণাৎ শহিদ হলেন। এলাইহি বক্স তখন আমজের আলীকে জড়িয়ে ছিলেন।[৩৪] চালিতাবাড়িয়ার তৈয়ব উদ্দিন আহম্মদ-এর নেতৃত্বে কয়েকজন সহযোদ্ধা এলাইহি বক্স এবং আমজের আলীকে কাঁধে করে পূর্ব নির্ধারিত স্থান শকুনী বটতলায় চলে গেলেন। "আর অন্যরা শত্রু বাহিনীর উপর প্রতিশোধ নেওয়ার জন্য শক্ত প্রতিরোধ গড়ে তুললেন এবং বিরতিহীন ফায়ার করতে লাগলেন। ভোর ৪টা পর্যন্ত উভয়পক্ষের মধ্যে তীব্র গোলাগুলি চলল এবং এরপর পাক মিলিশিয়ারা বাগআঁচড়া টু শংকরপুরের রাস্তা (ঐ রাস্তায় মুক্তিযোদ্ধাদের কোন দল ছিল না) দিয়ে পূর্ব দিকে পালিয়ে যেতে বাধ্য হলো।"[৩৫]

বাগআঁচড়া হাই স্কুলের প্রবেশ পথের উল্টোদিকে অবস্থানকারী তৃতীয় দলটি প্রথম দলটির অনুকরণে পোস্ট অফিসে অবস্থানরত মিলিশিয়াদের অবস্থান লক্ষ্য করে প্রচণ্ড ফায়ার শুরু করলে অপরপক্ষ থেকেও পাল্টা জবাব আসতে থাকে। এরই মধ্যে এই দলের কমান্ডার খবর পান যে, তার সহযোদ্ধাদের কেউ শহিদ এবং কেউ কেউ আক্রান্ত হয়েছেন, অতপর





হামিদের গোডাউন ছেড়ে শত্রুবাহিনী পলায়ন করছে। সঙ্গী হারানোর তীব্র বেদনা এই দলের সদস্যদের আরো উজ্জীবিত করে তোলে। কমান্ডার আবু বকর সিদ্দিক প্রথমে ক্রলিং করে পাকা রাস্তা পার হয়ে পোস্ট অফিসের পাশে অবস্থান গ্রহণ করেন। তাঁকে অনুসরণ করে অন্য সদস্যরাও পোস্ট অফিসের চারপাশ ঘিরে ফেলেন। স্বাভাবিক সময়ে রাজাকাররা পোস্ট অফিসের পাশে তৈরি করা মর্চে বা বাঙ্কারে পালাক্রমে অবস্থান করত। কিন্তু পরিস্থিতির বিহ্বলতায় তারা বাঙ্কারে প্রবেশ করতে পারেনি বা প্রবেশ করার অবস্থায় ছিল না, অথবা সেখানে প্রবেশ করার প্রয়োজনীয়তা বোধ করেনি। এমতাবস্থায় উভয়পক্ষের মধ্যে আরো কিছুক্ষণ গোলাগুলি চলার পর মিলিশিয়ারা গুলিবর্ষণ বন্ধ করে দেয়। আসলে তাদের কাছে আর কোনো গুলি ছিলনা। কমান্ডার যখন এ ব্যাপারে নিশ্চিত হলেন যে, তাদের কাছে কোনো লজিস্টিক সাপোর্ট নেই, তখন তিনি পোস্ট অফিসের জানালার পাশে অবস্থান নিয়ে ভেতরের পরিবেশ বোঝার চেষ্টা করতে লাগলেন। তিনি শুনতে পেলেন,

"ভেতর থেকে তাদের লিডার ওয়ারলেস সেট-এর মাধ্যমে পাকিস্তানি সেনাক্যাম্পে কথা বলছে। সে বলছে স্যার, আমরা এটাক্টড হয়েছি, আমাদের সাহায্য লাগবে। তখন আবার কেউ পাশ থেকে বলছে, বল স্যার আমরা সহি সালামতে ভালো আছি। তখন আবু বকর সিদ্দিক জানালার ভেতরে একটি হ্যান্ড গ্রেনেড নিক্ষেপ করে বলেছিলেন, নে এবার ভালো থাক। তারপর তিনি নিজেই আরো ৫/৬টি গ্রেনেড ভেতরে নিক্ষেপ করেছিলেন। তখন ভেতরে একটা ভয়ানক আতঙ্কের পরিবেশ সৃষ্টি হয়েছিল। তখন তিনি তাদেরকে আত্মসমর্পণের নির্দেশ দিলে তারা আত্মসমর্পণে রাজি হয়েছিল।"[৩৬]

এদিকে গোলাগুলির শেষ পর্যায়ে পোস্ট অফিসের ঠিক পেছনে অবস্থিত পুকুর পাড়ে অবস্থান নেওয়া এক মুক্তিযোদ্ধার কোমরে মিলিশিয়াদের একটি বুলেট আঘাত করলো এবং মুক্তিযোদ্ধার কোমরে রাখা গুলির প্যাকেটে লেগে তৎক্ষণাৎ আগুন ধরে গেলো। আক্রান্ত যোদ্ধা সুলতানপুরের বাহাদুর বিশ্বাস তখন টগবগে যুবক, তিনি বুদ্ধি করে তৎক্ষণাৎ পুকুরে নেমে পড়লে মোঃ আঃ জব্বার শেখ (বৈদ্যপুর) তাঁকে পুকুর থেকে উদ্ধার করলেন। আমৃত্যু তিনি আঘাতের চিহ্ন এবং ব্যথা সহ্য করেছিলেন।[৩৭]

এতসব ঘটনার পরে সমস্ত যোদ্ধা, বাগআঁচড়া বাজারের দক্ষিণ প্রান্ত থেকে কমান্ডার মোসলেম, মধ্যভাগ থেকে কমান্ডার গফফার পোস্ট

অফিসের সামনে চলে আসলেন। তিন কমান্ডারের সামনে পোস্ট অফিস থেকে এক একে আটজন মিলিশিয়া (অবশ্য সাথে একজন নিরপরাধ ব্যক্তি ছিলেন, তার সম্পর্কে জানতে পেরে মুক্তিযোদ্ধারা পরে তাকে মুক্তি দেন) হাত উঁচু করে বের হয়ে আসল। এদের কারো নাক নেই, কারো কান নেই, কারো কপাল ফেটে রক্ত ঝরছে, কারো কারো হাত-পা থেকে অনবরত রক্ত ঝরছে। অফিসের মধ্যে ৪/৫ জন মিলিশিয়ার লাশ পড়ে ছিল বলে মুক্তিযোদ্ধাদের কেউ কেউ বলেছেন কিন্তু দাবির পক্ষে প্রমাণ উপস্থান করা যায়নি। তবে এই গবেষক এখন পর্যন্ত সেখানে একজনের লাশ পড়েছিল বলে জানতে পেরেছেন। যে ব্যক্তি নিহত হয়েছিল তার নাম সৈয়দ আলী, পিতা: ছিপাহ, গ্রাম: পিঁপড়াগাছি, ইউনিয়ন: বাগআঁচড়া। স্বজনরা তাকে ডা. আফিল উদ্দীন ডিগ্রি কলেজের পশ্চিম পাশে অবস্থিত বাগআঁচড়া কবরস্থানে সমাহিত করেন। তবে বাংলাদেশে এখন তার কোনো বংশধর নেই বলে গবেষক সরেজমিন অনুসন্ধানে জানতে পেরেছেন। উল্লেখযোগ্য ব্যাপার হলো পাক মিলিশিয়াদের প্রায় সকলে নির্বিঘ্নে পালাতে সক্ষম হয়েছিল। তবে হামিদের গোডাউন এলাকা থেকে একজন রাজাকার মারাত্মক আহত অবস্থায় পালাতে সক্ষম হয়েছিল। তার নাম যন্তর (আসলে শব্দটি হবে যন্ত্র), আসল নাম ছিল আসমত আলী, পিতার নাম হযরত আলী, গ্রাম: বাগুড়ি (দাসপাড়া), পোস্ট: বাগআঁচড়া, ইউনিয়ন: কায়বা।[৩৮] মুক্তিযোদ্ধাদের গুলিতে সে মারাত্মকভাবে আহত হয়েছিল। তার পেটের নাড়িভুঁড়ি ছিড়ে গিয়েছিল এবং তাৎক্ষণিক পাকিস্তানিদের স্থানীয় সহযোগীরা তাকে যশোর সেনানিবাসে স্থানান্তরিত করেছিল। সেখানে উন্নত চিকিৎসার পরে সে প্রায় সুস্থ হয়ে উঠেছিল। এছাড়া পাক মিলিশিয়া বা তাদের সহযোগীদের আর কেউ গুরুতর আহত হয়েছিল বলে অনুসন্ধানে জানা যায়নি।

পোস্ট অফিস থেকে **১১**টি থ্রি নট থ্রি রাইফেল, **১১**টি বেউনেট, **১**টি ওয়ারলেস সেট উদ্ধার করা হয় এবং গ্রেফতারকৃত মিলিশিয়াদের প্রদত্ত তথ্যানুসারে আলবদর কমান্ডার বদর উদ্দীনের চাচাতো ভাই আনোয়ার হোসেনের বাড়ির পাশে হলুদ বাগান থেকে দুই বাক্স গুলি উদ্ধার করা হয়। উদ্ধারকৃত অস্ত্রগুলো ক্যাপ্টেন সফিকউল্যার নির্দেশে মুক্তিযোদ্ধাদের মধ্যে বণ্টন করে দেওয়া হয়। যখন মসজিদ থেকে ফজরের আজানের মধুর সুর ভেসে আসছিল তখন মুক্তিযোদ্ধারা গ্রেফতারকৃত আট মিলিশিয়াকে নিয়ে বাগআঁচড়া-রাড়ি পুকুরের সঙ্গমস্থল শকুনী বটতলায় এসে মিলিত হলেন।



কিন্তু মিলিত যোদ্ধারা আট মিলিশিয়া গ্রেফতারেও আনন্দিত হতে পারলেন না। কারণ তাদের একজন সহযোদ্ধা শহিদ হয়েছেন, আর দুইজন (একজন মারাত্মকভাবে) আহত হয়েছেন এবং আরেকজন শত্রুবাহিনীর হাতে গ্রেফতার হয়েছেন। খোঁজ নিয়ে তাঁরা জানতে পারলেন যে, ওমর আলী ওরফে 'বিচ্ছু ওমর'কে[৩৯] রাজাকাররা আটক করেছে। ঘটনাটি ছিল এরকম যে, বাগআঁচড়ার রাজাকার, আলবদর, আলশামস তথা মিলিশিয়ারা যেন নাভারণে অবস্থিত পাকিস্তানি সেনাবাহিনীর কর্তৃক স্থাপিত ক্যাম্পের সাথে যোগাযোগ করতে না পারে সেজন্য কলারোয়া উপজেলার কাউরিয়া গ্রামের ওমর আলীকে দায়িত্ব দিয়েছিলেন কমান্ডাররা। কারণ, ওমর আলী **১৭/১৮** বছরের একজন তরুণ যিনি দেখতে খুবই ছোটখাটো, অফুরন্ত প্রাণশক্তিতে উজ্জীবিত এবং ভীষণ রকমের সাহসী ছিলেন। তিনি কায়বার রেজাউল নামের একজন লোককে (পাবলিক) সাথে নিয়ে বাগআঁচড়া বাজারের একটু উত্তরে আলাউদ্দীন মিস্ত্রীর (কাঠমিস্ত্রী) সাতচালা টিনের বাড়ির (বর্তমানে জিয়া স্টোরের বিপরীত পাশের যে রাস্তাটি পশ্চিম দিকে বায়তুল আমান মসজিদের দিকে গেছে তার দক্ষিণ-পূর্ব কোণায় অবস্থিত ছিল) সামনে রাস্তার ধারের খুঁটিতে উঠে টেলিফোন লাইনের তার কেটে দিলেন। তার কাটার পর তাঁরা যখন মূল অপারেশন স্থল বাগআঁচড়া বাজারের দিকে আসতে চাইলেন তখন উভয়পক্ষের মধ্যে ব্যাপক গোলাগুলি চলছিল। সেই অবস্থায় তাঁরা দিক হারিয়ে ইউনিয়ন পরিষদের সামান্য উত্তরে বাগআঁচড়া-নাভারণ রোডের পশ্চিম পার্শ্বে যে রাস্তাটি আলবদর কমান্ডার বদরের বাড়ির দিকে গেছে সেই রাস্তা দিয়ে একটু এগিয়ে এক লোকের বাড়িতে ঢুকে পড়লেন। তখন বাড়ির মহিলাটি বলল, তোমরা চলে যাও নইলে আমার স্বামী কিন্তু দারুণ লোক, সে তোমাদের কথা বলে দিবে। এরকম কথায় কিছুটা ভয় পেয়ে তাঁরা সোজা চালিতাবাড়িয়া হয়ে চন্দনপুর যাওয়ার জন্য বোলমারী ও শোলাকুড়ো বিলের মধ্যে দিয়ে রওয়ানা হলেন। কিন্তু তার কেটে দেওয়ার যে ভীষণ শব্দ (চো চো আওয়াজের) রাজাকার বাহিনী শুনেছিল সেজন্য তাদের একটি গ্রুপ হন্যে হয়ে বোলমারী ও শোলাকুড়ো বিলের মধ্যদিয়ে সন্দেহভাজন ব্যক্তিদের অনুসন্ধান করতে লাগল। এক পর্যায়ে রাজাকার বাহিনী ওমর আলী ও তাঁর সহযোগীকে বিলের চারপাশ থেকে ঘিরে ফেলে আত্মসমর্পণে বাধ্য করল। তাঁরা বুদ্ধি করে এলএমজি'র গুলি মাটিতে পুঁতে ফেলতে পারলেও এলএমজি এবং কাতুড় (তার কাটার যন্ত্র) রাজাকাররা কেড়ে নিল এবং গ্রেফতার করে বাগআঁচড়া বাজারে নিয়ে

আসলো। রেজাউলকে পাবলিক মনে করে ছেড়ে দিলেও ওমর আলীকে পাক দোসররা বাজারের শিশুতলার কাছে কফিলউদ্দীন গাজীর বাড়ির দোতলায় নিয়ে গিয়ে বেদম প্রহার করার এক পর্যায়ে দোতলার সিঁড়ি থেকে ফেলে দিল।[৪০] ওমরের রক্তে পুরো সিঁড়ি রক্তাক্ত হলো, ব্যথা-যন্ত্রণা আর চিৎকারে বাগআঁচড়ার বাতাস সেদিন ভারী হয়ে উঠেছিল। তারপর তারা ওমরকে নাভারণ পাকসেনাদের ক্যাম্পে স্থানান্তর করলে নাভারণের পাকসেনারা তাঁকে যশোর সেনানিবাসে পাঠিয়ে দেয়।

তবে পাকসেনাদের খতম করার জন্য এ অভিযান পরিচালিত হলেও সৌভাগ্যক্রমে তারা সেদিন বাগআঁচড়া এলাকায় আসেনি বা আশেপাশের কোথাও নৈশভোজও করেনি। তবে মুক্তিযোদ্ধাদের একটি লক্ষ্য পূরণ না হলেও পাক মিলিশিয়াদের ব্যাপক ক্ষতি সাধিত হয়েছিল।

**যুদ্ধের বাকি দিনগুলো**

পরের দিন অর্থাৎ **২১** অক্টোবর ভোরের আলো ফোটার পূর্বেই মুক্তিযোদ্ধাদের দলটি এলাইহি বক্স-এর লাশ বহন করার পাশাপাশি গ্রেফতারকৃত আট পাক মিলিশিয়াকে পিছমোড়া করে হাত বেঁধে দাওনের মতো করে একসাথে নিয়ে চললেন চন্দনপুর ক্যাম্পের দিকে। মোট আটক নয়জন হলেও আদম আলী নামক একজনকে মুক্তিযোদ্ধারা ছেড়ে দিয়েছিলেন। কারণ রাজাকাররা নাভারণ বাজারে অবস্থিত তাদের পান-বিড়ির দোকান থেকে তাকে জোর করে ধরে দৈহিক নির্যাতনপূর্বক নাভারণ ক্যাম্পে না রেখে বাগআঁচড়া ক্যাম্পে পাঠিয়ে দেয়। পাক মিলিশিয়াদের উদ্দেশ্য ছিল, আদম আলীকে জিম্মী করে তার বোন-দুলাভাইকে পাকবাহিনীর বিরুদ্ধে যুদ্ধরত অবস্থা থেকে ফিরিয়ে আনা। কারণ তার বোন-দুলাভাই ঝিকরগাছা এবং নাভারণ এলাকায় পাকবাহিনীর ভীতির কারণ হয়ে দাঁড়িয়েছিলেন। তারা বলেছিল যে, তোর বড় বোন-দুলাভাই (বড় বোনের স্বামী) তো বিরাট মুক্তিযোদ্ধা। তাই যদি মুক্তি পেতে চাস তাহলে তোর বোন-দুলাভাইকে এনে হাজির কর, নইলে তোকে মেরে ফেলব।[৪১] ছাড়া পাওয়া সেই ব্যক্তির পুরো নাম ছিল মোঃ আদম আলী, পিতাঃ দাউদ হোসেন, মাতাঃ সরিতন নেছা, গ্রামঃ কাজীর বেড়, বুরুজ বাগান, ডাকঃ যাদবপুর, উপজেলাঃ শার্শা, জেলাঃ যশোর। তার দুলাভাই ছিলেন ইপিআর সদস্য বীর মুক্তিযোদ্ধা মোঃ আব্দুল জলিল (এলাকাবাসী, সহযোদ্ধা এবং পাকবাহিনীর কাছে তিনি রকেট জলিল নামে সমধিক





পরিচিত, তিনি ১৯৪৩ সালের ১০ নভেম্বর জন্মগ্রহণ করেন, ১৯৯৬ সালে তিনি বীর প্রতীক পদবি লাভ করেন এবং ২০১৭ সালের ৮ ডিসেম্বর শুক্রবার ইন্তেকাল করেন) পিতাঃ মহর আলী মোড়ল, মাতাঃ চেয়ার বানু, গ্রামঃ পাল্লা, ডাকঃ পাল্লা বাজার, উপজেলাঃ ঝিকরগাছা, জেলা যশোর। তিনিই বাগআঁচড়া যুদ্ধে অংশগ্রহণকারী মুক্তিযোদ্ধাদের নিকট থেকে আদম আলীকে মুক্ত করে নিয়ে যান।[৪২] যাই হোক ক্যাম্পে পৌঁছানোর পর এলাকাবাসী এলাইহি বক্সকে চন্দনপুর হাই স্কুলের সামনের রাস্তার পূর্ব পাশে সম্মানের সাথে দাফন করলেন আর পাক মিলিশিয়াদের স্কুলের দোতলায় ওঠানোর পর স্থানীয় জনতা প্রথমে রাইফেলের বাট দিয়ে তাদের তলপেট থেতো করে দেয় তারপর বেউনেট দিয়ে খুঁচিয়ে খুঁচিয়ে এবং শেষে গলা কেটে মৃত্যু নিশ্চিতপূর্বক দোতলা থেকে ফেলে দেয়। এরপর এলাকাবাসী গরুর গাড়িতে করে ৮টি লাশ ভারতের পশ্চিম বঙ্গের ইছামতি নদীর সীমান্ত চান্দুড়িয়া পয়েন্টে ফেলে দিয়ে আসলো।

অন্যদিকে যশোর সেনানিবাসে ওমর আলীর বিচার শুরু হলো। এ প্রসঙ্গে ভূক্তভোগীর বক্তব্য এরূপ,

"আর্মি অফিসাররা, মেজররা চেয়ারে বসে আছে। আমার কাছে জিজ্ঞাসা করেছিল, 'খান সেনারা কেইছা চিজ হয়? আমি উত্তর দিলাম আচ্ছা চিজ হয়। এরপর তারা বলল, ইয়া ছোট আদমি হয়, ছোড় দে। এই কথাটা আমার আজো মনে রয়েছে। এইবার বাড়ুই-টাড়ুয়ে নেলে, ঠ্যাংয়ে দড়ি বেন্দে উপর মুখো করে ঘণ্টা দেড়েক মতো টাঙিয়ে থুলো। তারপর এক দেড় ঘণ্টা পরে দড়ি সল দিয়ে কেটে দিলো, আমি নিচে থাকলাম, তারপর পিটুনি-টিটুনি দিয়ে নাভারণ হাসপাতালে পাঠিয়ে দিল। কোথায় আছি আমি কিচ্ছু জানি না। এর এক-দুই দিন পর আমি বলছি আমি কোথায় আছি। আমি জানিনা কিছু। তারপরে মরে গেছি বলে ওরা থুয়ে গেলো। তারপর জ্ঞান ফিরে আসলে ওরা নাভারণে গোডাউনে (বিখ্যাত রাজাকার তবি খাঁর নির্যাতন সেল) পুরে থুলো। পরে যেদিন প্লেন যুদ্ধ হচ্ছে সেদিন আমাদের ছেড়ে দিল। আমাকে ছেড়ে দিয়েছিল সুবর্ণখালীর আজিজ রাজাকার। এরপর হাঁটতে হাঁটতে আমি বাগআঁচড়া ফিরে আসলাম। তারপর চন্দনপুরের ক্যাম্পের লোকেরা উইথড্র করে বাগআঁচড়ায় আসলে তাঁরা আমাকে বাড়ি নিয়ে গেল।"[৪৩]

স্বাধীনতার পর কয়েক মাস তিনি প্রায় পুরোপুরি অসুস্থ ছিলেন। তারপর ধীরে ধীরে কিছুটা সুস্থ হলেও জীবনে কোনোদিন পুরোপুরি সুস্থ হননি। আজো মাঝেমধ্যে তাঁর পুরো শরীর চিন চিন করে, অবশ হয়ে যায়।

বাহাদুর বিশ্বাস আহত হলেও ডাঃ ময়েজ উদ্দিন আহম্মদ-এর চিকিৎসায় তিনি ধীরে ধীরে সুস্থ হয়ে ওঠেন। অন্যদিকে আমজের আলী মৃত্যুর সাথে পাঞ্জা লড়ে শেষ পর্যন্ত বেঁচে ছিলেন। গুলি খাওয়ার পর সেখানে ছোট একটি ঘরের কাছে অবস্থিত আম গাছের নিচে তিনি বসে পড়লেন এবং বললেন, "আমার আর সময় নেই, আমাকে একটু মুক্ত এলাকায় পৌঁছে দাও, আমার বাপ-মা এখনো বেঁচে আছে। আমার লোকজনের কাছে অস্ত্র-গুলি বুঝিয়ে দিলাম। রাড়ি পুকুর ময়নার বটতলায় পৌঁছে তিনি জীবন-মৃত্যুর সন্ধিক্ষণে পৌঁছালেন। আমি তখন শ্বাস নিতে পারছি না কিন্তু ছাড়তে পারছি, ভেতরে যতো হাওয়া আছে সব বেরিয়ে যাচ্ছে, আমার আর সময় নেই, বাঁচব না।"[৪৪] এরপর মুক্তিযোদ্ধাদের একটি গ্রুপ অতিদ্রুত তাঁকে চালিতাবাড়িয়া নিয়ে গেলে ডাঃ ময়েজ উদ্দিন আহম্মদ তার চিকিৎসা করলে তিনি কিছুটা সুস্থতা বোধ করেন এরপর সহযোদ্ধারা নিহত এবং আহত সকলকে জোংড়ায় করে আখের শিটে বিছিয়ে গরুর গাড়িতে করে চন্দনপুর ক্যাম্পে নিয়ে যান।[৪৫] এর কিছুক্ষণ পর চান্দুড়িয়া সীমান্তের কাছে ইছামতি নদীতে ভারতীয় বাহিনীর বোটে করে বসিরহাটের বদরতলা নিয়ে তাঁর চিকিৎসা করানো হয়। তবে সবচেয়ে কঠিন সময় গেছে যখন প্রতি ১৫ মিনিট পরপর একটি করে ইনজেকশন পুশ করা হয়। এই অবস্থা টানা তিনদিন চলে। কিছুদিন চিকিৎসার পর অবস্থার উন্নতি হলে তিনি আবার দেশে ফিরে এসে মুক্তিযোদ্ধাদের সাথে যোগ দেন। বর্তমানে বেশ কিছুদিন থেকে তিনি অসুস্থ, পা দুটো পুরোপুরি ফুলে গেছে, কিন্তু অর্থের অভাবে উপযুক্ত চিকিৎসা করাতে পারছেন না। মুক্তিযোদ্ধা হিসেবে যে ভাতা পান তা দিয়ে কোনমতে সংসার চলে। সম্মুখ সারির এসব দেশপ্রেমিক যোদ্ধাদের জন্য রাষ্ট্রীয় অর্থের এত অভাব কেনো? তাঁর জীবনের আর কোনো চাওয়া নেই, তবে যতদিন বেঁচে থাকবেন যেন সুস্থভাবে বেঁচে থাকতে পারেন সেই প্রার্থনা তাঁর।

এ যুদ্ধের পরে বাগআঁচড়া এলাকার রাজাকার, আলবদর, আলশামস বা শান্তি কমিটির সদস্যরা মানসিকভাবে ভেঙে পড়েছিল। যদিও ওমরকে ধরতে পেরে তারা আনন্দিত হয়েছিল কিন্তু কোনদিন নাভারণ-সাতক্ষীরা রাস্তার পশ্চিম পাশে আসতে সাহস দেখায়নি। ক্রমে ক্রমে তারা ব্যাকফুটে চলে যায় এবং ডিসেম্বর মাসের প্রথম দিক থেকে তারা পালানোর উপায় অনুসন্ধান করতে থাকে। কিন্তু তাদের কেউ কেউ রেহাই পেলেও কেউ কেউ যশোর এলাকা মুক্ত হওয়ার দিনে মুক্তিযোদ্ধা এবং সাধারণ জনতার গণপিটুনিতে মৃত্যুমুখে পতিত হয়। উদাহরণ হিসেবে আনোয়ার হোসেনের[৪৬] কথা উল্লেখ করা যায়।





## উপসংহার

উপরি-উক্ত আলোচনার পর বলা যায় যে, বাগআঁচড়া বাজার সম্মুখযুদ্ধ দেশের নানাবিধ স্থানে সংঘটিত অসংখ্য জনযুদ্ধের একটি। যুদ্ধের ধরন ও প্রকৃতি বিচারে এটি অবশ্যই একটি সম্মুখযুদ্ধ ছিল যেখানে গেরিলা যোদ্ধাদের পাশাপাশি সাধারণ মানুষ অংশ নিয়েছিল। ভারতীয় সীমান্তের সন্নিকটে হওয়ায় এলাকাটিতে মুক্তিযোদ্ধার সংখ্যা ছিল অতি নগণ্য। তাছাড়া এলাকার মুক্তিযোদ্ধারা দেশের অন্যান্য এলাকায় যুদ্ধরত থাকায় প্রধানত পার্শ্ববর্তী উপজেলার (কলারোয়া) মুক্তিযোদ্ধারা এতে সক্রিয় অংশগ্রহণ করেছিলেন। এলাকার অত্যাচারিত সাধারণ মানুষ সর্বোতভাবে এই যুদ্ধে সহযোগিতা করেছিলেন। স্বাধীনতার প্রায় অর্ধ শতাব্দী পরে এই যুদ্ধের তথ্য-উপাত্ত সংগ্রহ করা দুরূহ ছিল। অংশগ্রহণকারীদের অনেকেই আর বেঁচে নেই, যাঁরা বেঁচে আছেন তাঁদের কারো কারো স্মৃতিশক্তি খুবই দুর্বল। তরপরও এলাকার প্রবীণ ও প্রত্যক্ষদর্শী ব্যক্তিদের নিকট থেকে যথাযথ প্রক্রিয়ায় তথ্য-উপাত্ত সংগ্রহ করার চেষ্টা করা হয়েছে। এই যুদ্ধে একজন মুক্তিযোদ্ধা শহিদ এবং কয়েকজন আহত হলেও পাক মিলিশিয়াদের ব্যাপক ক্ষতি হয়। তাদের মধ্যে কমপক্ষে ১ জন ঘটনাস্থলে মারা যায় এবং ৮জন গ্রেফতার হয়ে পরে সাধারণ জনতার হাতে নির্মমভাবে নিহত হয়। ঘটনার পরে বাইরে থেকে আসা পাক মিলিশিয়াদের (রাজাকার, আনসার, আলবদর এবং আলশামস) দৌরাত্ম হ্রাস পায় যদিও স্থানীয় সহযোগীরা তাদের অত্যাচার অব্যাহত রাখে। এরপর ৬ ডিসেম্বর যশোর অঞ্চল মুক্ত হলে এলাকার পাকিস্তানি সহযোগীদের কেউ কেউ নিহত হয় এবং স্বাধীনতার পর অধিকাংশ অনেকেই এলাকা ত্যাগ করে এবং '৭৫ এ বঙ্গবন্ধুর মর্মান্তিক হত্যাকাণ্ডের পর তাদের প্রায় সবাই এলাকায় ফিরে আসে। এ যুদ্ধ সম্পর্কে অবগত হওয়ার পর এলাকাবাসী বিশেষ করে বর্তমান প্রজন্ম এ যুদ্ধে অংশগ্রহণকারী, শহিদ ও যুদ্ধাহতদের প্রতি কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করছেন।

এই প্রবন্ধ নিশ্চিত করে যে, পাকিস্তানিদের অধিকাংশ কর্মকাণ্ড ছিল প্রতিশোধমূলক। সেখানে ধর্ম-বর্ণ-লিঙ্গ নির্বিশেষে সবাই হত্যার শিকার হয়েছেন। কর্মকাণ্ডের ধরণ থেকেই জেনোসাইডের উদ্দেশ্য পরিষ্কার। তারা বাঙালিদের আত্মনিয়ন্ত্রণের অধিকার ও স্বাধীনতার দাবিকে নস্যাৎ করতে চেয়েছিল। তাদের বাঙালি-বিরোধী মনোভাব হিন্দু-বিরোধী মনোভাবের সাথে সম্পর্কিত। বাঙালি মুসলমানদেরকে অধস্তন মুসলমান হিসেবে বিবেচনা করা হতো, কারণ তারা হিন্দু প্রতিবেশী দ্বারা প্রভাবিত। ফলে তারা

যখন বাঙালিদের অভ্যুত্থানের বিরুদ্ধে জেনোসাইড পরিচালিত করে, তখন সেখানে সাম্প্রদায়িক মনোভাব সেই ঘটনাতে বড়ো ধরণের ভূমিকা পালন করে। অন্যদিকে এই ভূখণ্ডের অন্যান্য জাতিসত্তাকে নিয়ে বাঙালি সেই জেনোসাইডের বিরুদ্ধে রুখে দাঁড়াতে গিয়ে একটি নতুন রাষ্ট্রের জন্ম দিয়েছে।

বাগআঁচড়া সম্মুখ যুদ্ধক্ষেত্র

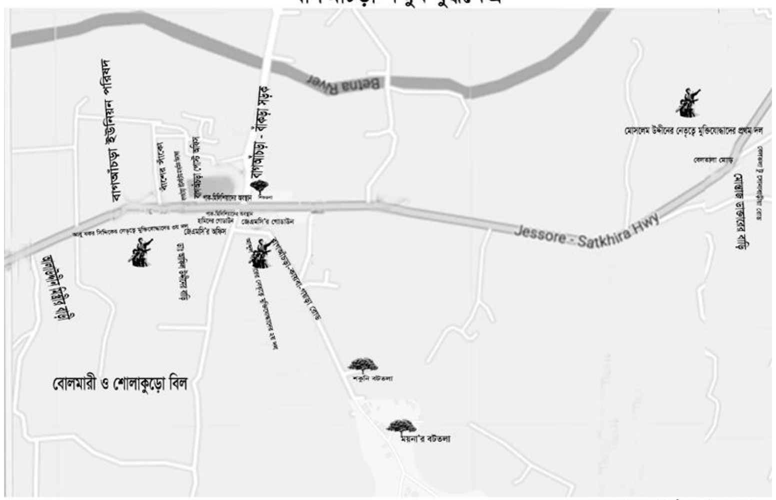


প্রবন্ধকার কর্তৃক প্রস্তুতকৃত

## তথ্যসূত্র

১. ১৯৭১ সালের ৭ই মার্চ বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান রেসকোর্স ময়দানে (বর্তমানে সোহরাওয়ার্দী উদ্যান) যে ভাষণ দিয়েছিলেন, সেখানে অত্যন্ত স্পষ্ট করে বলেছিলেন, "এবারের সংগ্রাম আমাদের মুক্তির সংগ্রাম, এবারের সংগ্রাম স্বাধীনতার সংগ্রাম"।

২. সৈয়দ আনোয়ার হোসেন, "বাংলাদেশ ১৯৭১: ইয়াহিয়া-মুজিব বৈঠক কেন ব্যর্থ হয়েছিলো?", *বিবিসি বাংলা*, ২৪ মার্চ ২০১৯, https://www.bbc.com/bengali/news-47686279, accessed on 3rd March 2021.

৩. তোফায়েল আহমেদ বলেন, "৭ই মার্চ ভাষণের মাধ্যমে তিনি (বঙ্গবন্ধু) একটি জাতিকে সশস্ত্র বাঙালি জাতিতে রূপান্তর করেছিলেন। স্বাধীনতার বীজ তিনি বপন করেছিলেন।" "বাংলাদেশ ১৯৭১: ইয়াহিয়া-মুজিব বৈঠক কেন ব্যর্থ হয়েছিলো?", *বিবিসি বাংলা*, ২৪ মার্চ ২০১৯, https://www.bbc.com/bengali/news-47686279, accessed on 3rd March 2021.

৪. যশোর জেলায় মুক্তিযুদ্ধকালীন সংঘটিত উল্লেখযোগ্য ঘটনার সংক্ষিপ্ত বর্ণনা (৩য় পর্যায়ের তালিকা)। এই ৩য় তালিকায় মোট ২৮টি সম্মুখযুদ্ধের উল্লেখ করা হয়েছে যার ২৮ নং ক্রমিকে 'বাগআঁচড়া সম্মুখ যুদ্ধ' স্থান পেয়েছে। তবে ঠিক কত তারিখে এই যুদ্ধ সংঘটিত হয়েছিল তার কোনো উল্লেখ নেই। উল্লেখ্য যে, ৫-৪-২০১২ খ্রিস্টাব্দে এই তালিকা চূড়ান্তভাবে অনুমোদন করা হয় যেখানে খলিফা মোঃ আবুল কালাম আজাদ (নির্বাহী প্রকৌশলী, এলজিইডি, যশোর), এ. এইচ. এম মুযহারুল ইসলাম মন্টু (ইউনিট কমান্ডার, বাংলাদেশ মুক্তিযোদ্ধা সংসদ, যশোর জেলা ইউনিট কমান্ড) এবং মোঃ মোস্তাফিজুর রহমান (জেলা প্রশাসক, যশোর)-এর স্বাক্ষর রয়েছে। http://www.jessore.gov.bd/site/page/bf85f3e6-1c4a-11e7-8f57-286ed488c766/মুক্তিযুদ্ধ%20ও%20 মুক্তিযোদ্ধার%20তালিকা, accessed on 5th March 2021.

৫. "বেতনা নদী বাগআঁচড়া এলাকার মানুষকে নানাভাবে সমৃদ্ধ করেছে। একটা সময় শিল্প-সাহিত্যের কোন কোন শাখায় এখানকার কেউ কেউ অন্যান্যদের পথ দেখিয়েছিলেন। উদাহরণ হিসেবে বাগআঁচড়া-নিবাসী তারকনাথ গঙ্গোপাধ্যায়-এর কথা উল্লেখ করা যেতে পারে। তিনি স্বর্ণলতা'র মত গার্হস্থ্য উপন্যাস লিখে বঙ্গসাহিত্যে অমরত্ব লাভ করেছেন। এর মাধ্যমে তিনি গরিবের ঘরের প্রকৃত চিত্র উন্মোচন করতে সক্ষম হন এবং এ বিষয়ের প্রথম প্রবর্তক। পরবর্তীকালে খুলনার অন্তর্গত বিষ্ণুপুর-নিবাসী শ্রীযুক্ত বিধুভূষণ বসু তার 'লক্ষ্মীমেয়ে', 'লক্ষ্মীমা' ও 'লক্ষ্মীবউ' প্রভৃতি উপন্যাসে তারকনাথের পথানুবর্তন করে খ্যাতিলাভ করেছিলেন।" উৎস: সতীশচন্দ্র মিত্র, *যশোহর-খুলনার ইতিহাস*, দ্বিতীয় খণ্ড, শিবশঙ্কর সম্পা., দ্বিতীয় সং. (কলিকাতা: দাশগুপ্ত অ্যাণ্ড কোম্পানি প্রাইভেট লিমিটেড, ১৯৬৫), পৃ. ৮৭০।

৬. দলিল দস্তাবেজ বা লিখিত উপাদানকে বিশেষ কাজে না লাগিয়ে কোনো বিশেষ ঘটনায় একজন ব্যক্তির সম্পৃক্ততা বা প্রত্যক্ষদর্শী হিসেবে বহুজনের সাক্ষাৎকারের

ভিত্তিতে যে ইতিহাস নির্মিত হয় আমরা তাকে Oral History বা মুখের কথায় ইতিহাস বা কথ্য ইতিহাস অভিহিত করতে পারি। উৎস: মোঃ সেলিম, "বাংলাদেশে ওরাল হিস্ট্রি চর্চা," *সমাজ নিরীক্ষণ*, সংখ্যা ৭৯, পৃ. ৮৪।

৭. মোঃ মাহমুদ আলম, "বাচনিক ইতিহাস: প্রত্যয়, প্রকৃতি ও প্রয়োগ," *ইনস্টিটিউট অব বাংলাদেশ স্টাডিজ জার্নাল*, সংখ্যা ২২ (১৪২১ বঙ্গাব্দ), পৃ. ৮১।

৮. এর ব্যখ্যায় বলা যায়, A retrospective approach looks backwards and examines exposures to scrutinise factors in relation to an outcome that is established at the start of the studz." Yogesh Kumar Singh, *Fundamental of Research Methodology and Statistics* (New Delhi: New Age International (p) Ltd., 2006), pp. 112-115.

৯. মুহাম্মদ জালাল উদ্দিন, *ঝিকরগাছা উপজেলার ইতিহাস*, প্রথম প্রকাশ (ঢাকা, গতিধারা, ২০১৩), পৃ. ১০৪-১০৫।

১০. তদেব, পৃ. ১০৫।

১১. মোঃ আনিসউদ্দীন খান (অবসরপ্রাপ্ত প্রধান শিক্ষক, বাগআঁচড়া ইউনাইটেড মাধ্যমিক বিদ্যালয়), পিতা: মৃত আক্কাজ আলী খান, গ্রাম ও পোস্ট: বাগআঁচড়া, ইউনিয়ন: বাগআঁচড়া, উপজেলা, শার্শা, জেলা: যশোর, সাক্ষাৎকার গ্রহণের স্থান ও তারিখ: নিজ বাড়ি, ২৬ ফেব্রুয়ারি ২০২১।

১২. মুহাম্মদ জালাল উদ্দিন, *ঝিকরগাছা উপজেলার ইতিহাস*, পৃ. ১০৫।

১৩. প্রকৃতপক্ষে কতজন আহত বা নিহত হয়েছিল তার নির্দিষ্ট কোনো হিসাব নেই। একেক সূত্র একেক সংখ্যা উল্লেখ করেছে, তবে প্রত্যক্ষদর্শীদের কেউ কেউ জানিয়েছেন নিহতদের সংখ্যা কমপক্ষে ২০ জন বা ততোধিক হবে। নিহতদের লাশ সেখানে অনেকক্ষণ পড়ে ছিল এবং দিকবিদিক জ্ঞানশূন্য হিন্দুরা আক্রমণের প্রথম পর্যায়ে অত্র এলাকার বিভিন্ন অপরিচিত স্থানে পালিয়ে যায়। পরবর্তীতে পাকসেনা এবং পাক মিলিশিয়ারা চলে গেলে তারা স্বজনদের লাশ নিয়ে যায়। রাজাকার এবং স্থানীয় কেউ কেউ শুকরের গলা থেকে হিন্দু নারীদের অলংকার খুলে নেয়। হিন্দুরা মনে করেছিল যে, শুকরের গলায় অলংকার বেঁধে রাখলে মুসলমানদের কেউ সেগুলো নিবে না। কিন্তু লুটপাটের নেশা তাদেরকে এমনভাবে অন্ধ করে দিয়েছিল যে, রাজাকার, আলবদর, আলশামস-এর সদস্যদের কেউ কেউ শুকরের গলা থেকে স্বর্ণালংকার খুলে নিতে দ্বিধা করেনি। উৎস: মাসুদুর রহমান, "ইলিশপুর গণহত্যা," হারুন-অর-রশিদ সম্পা., *বাংলাদেশ মুক্তিযুদ্ধ জ্ঞানকোষ*, প্রথম প্রকাশ, ১ম খণ্ড (ঢাকা: বাংলাদেশ এশিয়াটিক সোসাইটি, ২০২০), পৃ. ৩৫৭; মোঃ কুরবান আলী মোড়ল, পিতা: মোঃ জব্বার আলী মোড়ল, গ্রাম: বাগুড়ী, পোস্ট: উপজেলা: শার্শা, জেলা: যশোর, সাক্ষাৎকার গ্রহণের স্থান ও তারিখ: বাগআঁচড়া বাজার, ৩০ অক্টোবর ২০২০।

১৪. পরবর্তীকালে যশোর সেনানিবাস থেকে দেওয়া সাময়িক অভিযোগ পত্রে (Tentative Charge Sheet) তাঁদের বিরুদ্ধে নিম্নরূপ অভিযোগ উত্থাপন করা হয়েছিল যেখানে DSMLA, Sub-Sector-8 এর Staff Officer হিসেবে Liaj



নামে একজনের স্বাক্ষরসহ তারিখ ২ সেপ্টেম্বর ১৯৭১ উল্লেখ করা হয়েছিল। গ্রেফতারকৃতদের মধ্যে একজনের সাময়িক অভিযোগ পত্রে লেখা ছিল:

The accused Amir Ali Molla son of Tasirruddin Mollah of Deganga PS. Kolaroa, Dist- Khulna is charged with.

If with intent to help the recalcitrants, any person does any act, which is designed or is likely to give assistance to the operatins of the recalcitrants, or to impede operations of Pakistan Forces, or to endanger life.

In that he at Broja Boksha-Navaran-Kalaroa road on 15 July 71 with intent to help recalcitrants by collaborating with Mukti-Fouje, who fired at the vehicles and injured army personnel. সাময়িক অভিযোগ পত্রের এই কপিটি লেখক কলারোয়া উপজেলার কেরালকাতা ইউনিয়নের কাউরিয়া গ্রামে বসবাসরত আমির আলী মোল্লা'র নিকট থেকে সংগ্রহ করেছেন যিনি ১৫ জুলাই '৭১ সালের পাক বাহিনীর হাতে গ্রেফতার হয়েছিলেন। গভীরভাবে লক্ষ্য করলে দেখা যাবে যে, উক্ত অভিযোগ পত্রের কয়েকটি ভুল চোখে পড়ার মতো, পিতা এবং পুত্রের নামের পদবি মোল্লা বানানটি দুই স্থানে দুই রকম; গ্রামের নাম হবে কাউরিয়া, কিন্তু দিঘাং উল্লেখ করা হয়েছে, কলারোয়া বানান দুই স্থানে দুই রকম। ১৫ জুলাই ২/৩ দফায় অভিযান চালিয়ে বিভিন্ন স্থান থেকে কমপক্ষে প্রায় ৩০জন (আনুমানিক) ব্যক্তিকে গ্রেফতার করে প্রত্যেকের নামে আলাদা আলাদা অভিযোগ পত্র প্রদান করা হয়। তবে বিভিন্ন কারণে অন্য কারো নিকট থেকে ইস্যুকৃত অভিযোগ পত্রগুলো পাওয়া সম্ভব হয়নি।

১৫. ঐ ঘটনায় মুক্তিপ্রাপ্তদের অন্যতম ছিলেন চাঁদ আলী সরদার। তাঁর বড় মেয়ে গবেষককে জানিয়েছেন যে, "যেদিন বাবাকে গ্রেফতার করে নিয়ে যায়, সেদিন যেন তাদের (গ্রেফতারদের) গুলি করে হত্যা না করে সেজন্য জনপ্রতি ৫,০০০/- টাকা করে দেওয়া হয়েছিল। ঐ অর্থ থানা এবং পাকসেনারা গ্রহণ করেছিল। এমনিভাবে সাতক্ষীরা জেলা কারাগারে থাকাকালীন সময়ে আরো দুইবার ৫,০০০/- টাকা করে দেওয়া হয়েছিল যাতে তারা বাবাকে বাঁচিয়ে রাখে। কারণ পাকসেনারা প্রায়ই টাকার জন্য গ্রেফতারকৃতদের পরিবারকে চাপ দিত এই বলে যে, যদি টাকা না দাও তাহলে কালকেই তাদেরকে গুলি করে হত্যা করা হবে। এরকম খবর এলাকার লোকজন জানার পর কোন কোন ক্ষেত্রে চাঁদা তুলে ঐ চাহিত পরিমাণ টাকা সংগ্রহ করে দিত।" যুদ্ধপীড়িত একটি দেশের গ্রামীণ লোকদের নিকট থেকে ঐ পরিমাণ অর্থ সংগ্রহ করা যে কীরূপ কঠিন ছিল তা কেবল ভুক্তভোগীরা বলতে পারেন। উৎস: মিসেস হালিমা পারভীন, স্বামী: মৃত ফজলুর রহমান, গ্রাম ও পোস্ট: বাগআঁচড়া, উপজেলা: শার্শা, জেলা: যশোর, সাক্ষাৎকার গ্রহণের স্থান ও তারিখ: নিজ বাড়ি, ১ মার্চ ২০২১।

১৬. তাঁদের মধ্যে একজন ছিলেন যুগিখালী ইউনিয়নের পাঁচনল গ্রামের মৃত ইমান আলী মোড়লের পুত্র মোঃ আব্দুর রশিদ। অপরজন হলেন কয়রা ইউনিয়নের পরানপুর গ্রামের মৃত ইজ্জত উল্লার পুত্র মোঃ মতিয়ার রহমান। ২০০৬ সালের জানুয়ারি

মাসের ১৭ তারিখ গেজেট প্রকাশের মাধ্যমে বাংলাদেশ সরকার তাঁদেরকে মুক্তিযোদ্ধার মর্যাদা প্রদান করেন।

১৭. মুহাম্মদ জালাল উদ্দিন, *ঝিকরগাছা উপজেলার ইতিহাস*, পৃ. ১১৩।

১৮. মাসুদুর রহমান, "ইলিশপুর রাজার ক্যাম্প অপারেশন," হারুন-অর-রশিদ সম্পা., *বাংলাদেশ মুক্তিযুদ্ধ জ্ঞানকোষ*, প্রথম প্রকাশ, ১ম খণ্ড (ঢাকা: বাংলাদেশ এশিয়াটিক সোসাইটি, ২০২০), পৃ. ৩৫৭-৩৫৮।

১৯. গ্রেফতারকৃত সকলের নাম আজ আর মনে নেই, তবে এর মধ্যে ১ জন তুলসিডাঙ্গা, ১জন ওফাপুর, ১জন হেলাতলা (রাজাকার কমান্ডার আফিল উদ্দিন) এবং ২জন কুশোডাংগা এলাকার। উৎস: মোঃ আঃ জব্বার শেখ (বীর মুক্তিযোদ্ধা), পিতা: মৃত খলিল সানা, গ্রাম: বৈদ্যপুর, পোস্ট: বামনখালী, ইউনিয়ন: যুগিখালী, উপজেলা: কলারোয়া, জেলা: সাতক্ষীরা, সাক্ষাৎকার গ্রহণের স্থান ও তারিখ: কলারোয়া উপজেলা মুক্তিযোদ্ধা কমান্ড কার্যালয়, তারিখ: ৮ জুলাই ২০২০।

২০. মোঃ আঃ রাজ্জাক, পিতা: মুন্সি মোঃ এজহার আলী, গ্রাম ও পোস্ট: বাগআঁচড়া, উপজেলা: শার্শা, জেলা: যশোর। সাক্ষাৎকার গ্রহণের স্থান ও তারিখ: নিজ বাড়ি, ২ ফেব্রুয়ারি ২০২১।

২১. শেখ কোরবান আলী, পিতা: মৃত শেখ মহাতাব আলী, গ্রাম: রাড়িপুকুর, পোস্ট: বাগআঁচড়া, উপজেলা: শার্শা, জেলা: যশোর। সাক্ষাৎকার গ্রহণের স্থান ও তারিখ: ডাঃ আফিল উদ্দীন কলেজ পট্টি, বাগআঁচড়া, ২৪ মার্চ ২০২১।

২২. আব্দুল গফফার (বীর মুক্তিযোদ্ধা ও যুদ্ধকালীন কমান্ডার), পিতা: মৃত তছির উদ্দিন গাজী, গ্রাম: বহুড়া, ইউনিয়ন: কেরালকাতা, উপজেলা: কলারোয়া, জেলা: সাতক্ষীরা, সাক্ষাৎকার গ্রহণের স্থান ও তারিখ: কলারোয়া উপজেলা মুক্তিযোদ্ধা কমান্ড কার্যালয়, তারিখ: ৪ জুলাই ২০২০।

২৩. মোঃ নুর হোসেন (বীর মুক্তিযোদ্ধা), পিতা: মৃত অহেদ আলী সরদার, গ্রাম: কাদপুর, ইউনিয়ন: চন্দনপুর, উপজেলা: কলারোয়া, জেলা: সাতক্ষীরা, সাক্ষাৎকার গ্রহণের স্থান ও তারিখ: কলারোয়া উপজেলা মুক্তিযোদ্ধা কমান্ড কার্যালয়, তারিখ: ৪ জুলাই ২০২০।

২৪. প্রথমে কমান্ডার মোসলেম উদ্দিনের নেতৃত্বে ১০/১৫ জনের একটি ছোট গ্রুপ সেখানে ঘাঁটি স্থাপন করে এবং বালিয়াডাঙ্গা যুদ্ধের ৭/৮ দিন পরে কমান্ডার আব্দুল গফফারের নেতৃত্বে ১০/১১ জনের আরেকটি ছোট গ্রুপ আসে এবং সবশেষে আসে কমান্ডার আবু বকর সিদ্দিকের গ্রুপটি। উৎস: শ্রী চিত্তরঞ্জন বিশ্বাস (বীর মুক্তিযোদ্ধা), পিতা: মৃত রামপদ বিশ্বাস, গ্রাম: কেঁড়াগাছি, ইউনিয়ন: কেঁড়াগাছি, উপজেলা: কলারোয়া, জেলা: সাতক্ষীরা, সাক্ষাৎকার গ্রহণের স্থান ও তারিখ: কলারোয়া উপজেলা মুক্তিযোদ্ধা কমান্ড কার্যালয়, তারিখ: ৮ জুলাই ২০২০; মোঃ আশরাফ আলি (বীর মুক্তিযোদ্ধা), পিতা: মৃত আফছার আলি, গ্রাম: কেঁড়াগাছি, ইউনিয়ন: কেঁড়াগাছি, উপজেলা: কলারোয়া, জেলা: সাতক্ষীরা, সাক্ষাৎকার গ্রহণের স্থান ও তারিখ: কলারোয়া উপজেলা মুক্তিযোদ্ধা কমান্ড কার্যালয়, তারিখ: ৪ জুলাই ২০২০; মোঃ ইমাম আলি (বীর মুক্তিযোদ্ধা), পিতা: মৃত সিরাজ সরদার, গ্রাম: সুলতানপুর, ইউনিয়ন: চন্দনপুর, উপজেলা: কলারোয়া, জেলা: সাতক্ষীরা, সাক্ষাৎকার গ্রহণের স্থান ও তারিখ: কলারোয়া উপজেলা মুক্তিযোদ্ধা কমান্ড কার্যালয়, তারিখ: ৪ জুলাই ২০২০।





২৫. উল্লেখ্য যে, এর পূর্বেও সেখানে মুক্তিযোদ্ধাদের আরেকটি গ্রুপ ঘাঁটি স্থাপন করেছিল। কিন্তু স্থানীয় মানুষের সাথে তাঁরা সম্পর্ক স্থাপন করতে পারেননি। কিন্তু এই গ্রুপগুলোর কমান্ডারবৃন্দ বলেছিলেন, আমরা শুধুমাত্র মাতৃভূমি উদ্ধারের জন্য এসেছি, অন্য কোনো উদ্দেশ্য নেই। জনগণই আমাদের বন্ধু। জনগণের মুক্তির জন্যই আমাদের লড়াই। সুতরাং আপনাদের সাহায্য-সহযোগিতা ছাড়া আমরা চলতে পারব না এবং লক্ষ্যেও পৌঁছাতে পারব না। উৎস: আব্দুল গফফার (বীর মুক্তিযোদ্ধা ও যুদ্ধকালীন কমান্ডার); মোঃ আবুল হোসেন গাজী (বীর মুক্তিযোদ্ধা), পিতা: মৃত আফিল উদ্দীন গাজী, গ্রাম: পারিখুপী, ইউনিয়ন: হেলাতলা, উপজেলা: কলারোয়া, জেলা: সাতক্ষীরা, সাক্ষাৎকার গ্রহণের স্থান ও তারিখ: কলারোয়া উপজেলা মুক্তিযোদ্ধা কমান্ড কার্যালয়, তারিখ: ৪ জুলাই ২০২০; মোঃ শওকত আলি শেখ (বীর মুক্তিযোদ্ধা), পিতা: মৃত আফিল উদ্দীন গাজী, গ্রাম: বৈদ্যপুর, ইউনিয়ন: যুগিখালী, উপজেলা: কলারোয়া, জেলা: সাতক্ষীরা, সাক্ষাৎকার গ্রহণের স্থান ও তারিখ: কলারোয়া উপজেলা মুক্তিযোদ্ধা কমান্ড কার্যালয়, তারিখ: ৩০ জুলাই ২০২০; মোঃ আব্দুর রউফ (বীর মুক্তিযোদ্ধা), পিতা: মৃত রুহুল আমিন সরদার, গ্রাম: রামভদ্রপুর, ইউনিয়ন: চন্দনপুর, উপজেলা: কলারোয়া, জেলা: সাতক্ষীরা, সাক্ষাৎকার গ্রহণের স্থান ও তারিখ: কলারোয়া উপজেলা মুক্তিযোদ্ধা কমান্ড কার্যালয়, তারিখ: ৩০ জুলাই ২০২০।

২৬. আব্দুল গফফার (বীর মুক্তিযোদ্ধা ও যুদ্ধকালীন কমান্ডার)।

২৭. তদেব।

২৮. বাগআঁচড়া টু কায়বা ও গয়ড়া জিসি রোড থেকে রাড়িপুকুর গ্রামে প্রবেশের প্রধান রাস্তার মোড়ে অবস্থিত বিশালায়তন এক বট গাছ। কথিত আছে যে, ময়না নামের এক মুসলিম বুড়ি শতাধিককাল পূর্বে এই গাছটি লাগিয়েছিলেন। এর বয়স কত তা সঠিকভাবে কেউ বলতে পারেননি। গ্রামের প্রবীণ ব্যক্তিরা বলেছেন যে, তারা জ্ঞানবুদ্ধি হওয়ার পর থেকে গাছটি এরকম দেখছেন। উদার এবং পরোপকারী ময়না ছিলেন বন্ধ্যা, কিন্তু তিনি হিন্দু অধ্যুষিত ঐ গ্রামের নারী ও কিশোরীদের ইজ্জত ও সম্ভ্রম রক্ষায় সবসময় এগিয়ে যেতেন বলে এলাকাবাসী লোকমুখে বংশ পরম্পরায় শুনে আসছেন। গ্রামের পূর্ব পাশে অবস্থিত গোয়ালা পুকুরে তিনি কলস এবং জালা (ধান বা গম রাখার বড় পাত্র) নিয়ে উপস্থিত থাকতেন এবং মুসলিম নারী ও কিশোরীরা যাতে হয়রানির শিকার না হয় সেজন্য প্রস্তুত থাকতেন। আর ময়নার বটতলা উন্মুক্ত স্থান হওয়ায় কৌশলগতভাবে এলাকাটি মুক্তিযোদ্ধাদের জন্য সুবিধাজনক ছিল। উৎস: মোঃ আঃ রাজ্জাক, সাক্ষাৎকার গ্রহণের স্থান ও তারিখ: নিজ বাড়ি, ২ ফেব্রুয়ারি ২০২১; শেখ কোরবান আলী, পিতা: মৃত শেখ মহাতাব আলী, গ্রাম: রাড়ি পুকুর, পোস্ট: বাগআঁচড়া, উপজেলা: শার্শা, জেলা: যশোর। সাক্ষাৎকার গ্রহণের স্থান ও তারিখ: ডাঃ আফিল উদ্দীন কলেজ পট্টি, বাগআঁচড়া, ২৪ মার্চ ২০২১।

২৯. মোস্তাজ ডাক্তার আসলে সাতক্ষীরা জেলার আশাশুনি থানার প্রতাপনগর ইউনিয়নের বাসিন্দা ছিলেন। সেখানে ডাকাতি এবং হত্যা মামলার আসামি হিসেবে স্বাধীনতার ১০/১২ বছর পূর্বে পালিয়ে বাগআঁচড়ার বেলতলা এলাকায় চলে আসেন। তারপরও তিনি রেহাই পাননি। শাস্তি হিসেবে ৭ বছরের কারাবাস করে যুদ্ধের ২/৩ বছর পূর্বে তিনি মুক্তি পান। তার বাড়ি ছিল বেলতলা থেকে যে রাস্তাটি সোনাবাড়িয়ার দিকে চলে গেছে তার উত্তর-পূর্ব কোণায় (নাভারণ-সাতক্ষীরা রাস্তার পূর্ব পাশে)। সেখানে মাটির দেয়াল আর টালির ছাউনি দেওয়া ঘরে তিনি পরিবারসহ বসবাস করতেন। তার বড় ছেলে আব্দুর রশিদ ছিলেন হাকিমি ডাক্তার। যুদ্ধের সময় তিনি বাগুড়ি গ্রামের পূর্ব পাশে বেতনার পশ্চিম পাশে শ্মশানঘাটে (যা এলাকাবাসীর নিকট মুচিপোতা নামে পরিচিত) বড় দাঁ নিয়ে দাঁড়িয়ে থাকতেন। ঐ এলাকার সাধারণ লোক এবং মুক্তিযুদ্ধের পক্ষের সক্রিয় কোনো লোক পেলে তাকে শারীরিকভাবে হয়রানি এবং লাঞ্ছিত করতেন। উৎস: নাম প্রকাশে অনিচ্ছুক এক প্রত্যক্ষদর্শী, গ্রাম ও পোস্ট: বাগআঁচড়া, উপজেলা: শার্শা, জেলা: যশোর, সাক্ষাৎকার গ্রহণের স্থান ও তারিখ: বাগআঁচড়া বাজার, ২ ফেব্রুয়ারি ২০২১।

৩০. বাগআঁচড়া ডা. আফিল উদ্দীন ডিগ্রি কলেজের পশ্চিম পাশে (বাগআঁচড়া টু কায়বা ও গয়ড়া জিসি সড়ক-এর উত্তর পাশে) একটি কবরস্থান আছে। সেই কবরস্থান থেকে দক্ষিণ দিকে রাড়ি পুকুরের দিকে ঢুকতে দক্ষিণ-পূর্ব কোণায় মাঝারি আকৃতির একটি বট গাছ ছিল। বলতে গেলে গাছটি বড় হওয়ার পর থেকে এর মাথায় অনেকগুলো শকুন সব সময় বসে থাকত। ধারণা করা হয় কোন এক সময় ঐ এলাকায় ভাগাড় ছিল এবং সেখান থেকে খাদ্য খেয়ে তারা ঐ গাছে বিশ্রাম নিত অথবা, খাবারের সন্ধানে তারা ঐ গাছে অবস্থান করত। সেই কারণে এলাকাবাসী গাছটিকে 'শকুনি বটগাছ' বলে ডাকতে থাকে। পরবর্তীতে সেই গাছের নিচে গ্রামের লোকদের জমজমাট আড্ডা বসতে শুরু করে। এরই ধারাবাহিকতায় এলাকাবাসী কোন অনুষ্ঠানের আয়োজন করতে ঐ বট গাছের তলা বেছে নিতেন। সেই থেকে স্থানটির নাম 'শকুনি বটতলা' বলে পরিচিতি পায়। অবশ্য নব্বই-এর দশকে সেই গাছ কেটে ফেলা হয় এবং বর্তমানে স্থানটিতে ভবন তৈরি করে মার্কেট হিসেবে ব্যবহার করা হচ্ছে।

৩১. এটি ছিল সরাসরি কৃষকদের নিকট থেকে সরকারিভাবে ক্রয়কৃত পাট রাখার বিরাট গোডাউন। এর অফিস ছিল আব্দুল হামিদের গোডাউনের ঠিক পশ্চিম পাশে। অর্থাৎ গোডাউন ছিল ঐ রাস্তার দক্ষিণ পাশে আর অফিস ছিল উত্তর পাশে।

৩২. ফিনল্যান্ডের অধিবাসী ফিনস বা ফিনিসিয়রা সর্বপ্রথম 'উইন্টার যুদ্ধে' এই মোলোটভ ককটেইল ব্যবহার করে। এরপর থেকে সমগ্র পৃথিবীতে এই ককটেইল ব্যাপকহারে ব্যবহৃত হচ্ছে। বিহার ট্রেইনিংপ্রাপ্ত মুজাহিদরা এই ককটেইল তৈরিতে পারদর্শী ছিলেন। তাই উক্ত প্রশিক্ষণপ্রাপ্তরা যখন মুক্তিযুদ্ধে যোগদান করেন তখন থেকে যেকোন অভিযানে তাঁরা ব্যাপকহারে এর ব্যবহার করতে থাকেন। উল্লেখ্য যে, বাগআঁচড়া যুদ্ধে মুজাহিদ প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত অনেকেই যোগদান করেছিলেন। যদিও এই যুদ্ধে ককটেইল নিক্ষেপকারী এলাহী বক্স-এর এই ধরনের কোন প্রশিক্ষণ ছিল না।





উৎস: আব্দুল গফফার (বীর মুক্তিযোদ্ধা ও যুদ্ধকালীন কমান্ডার)।

৩৩. এই বীরের পারিবারিক নাম এলাহী বক্স প্রধানিয়া, পিতা মৃত ইয়াকুব আলী প্রধানিয়া। গ্রাম: ১ নং কলোনী, পোস্ট: বসতপুর, ইউনিয়ন: বাগআঁচড়া, উপজেলা: শার্শা, জেলা: যশোর। কিন্তু সরকারি গেজেটে মুক্তিযোদ্ধাদের তালিকায় তাঁর নাম এলাহী বক্স, পিতা: এয়াকুব আলী বয়াতি, গ্রাম: বসতপুর উল্লেখ রয়েছে। তবে সরেজমিন অনুসন্ধানে গবেষক জানতে পেরেছেন তাঁর পারিবারিক পদবি হলো প্রধানিয়া। তবে তার পিতা একজন সত্যিকারের বয়াতি ছিলেন। আর সে কারণে সম্ভবত পিতার নামের সাথে বয়াতি উল্লেখ করা হয়েছে। এছাড়াও তাঁর পৈতৃক বাড়ি গবেষক পরিদর্শন করেছেন যা ১ নং কলোনী গ্রামে অবস্থিত। সেখানে বর্তমানে তার একমাত্র চাচাতো বোন ছাড়া আর কেউ বসবাস করেন না। উল্লেখ্য যে, এলাহী বক্স পিতা-মাতার একমাত্র সন্তান ছিলেন। তিনি বিয়ে করেছিলেন কিন্তু যুদ্ধে অংশগ্রহণ করে শহিদ হওয়ার পূর্ব পর্যন্ত তাঁর কোন সন্তান হয়নি। তখন তাঁর বয়স ছিল আনুমানিক ২৪/২৫ বছর এবং পেশায় কৃষক ছিলেন বলে এলাকাবাসী গবেষককে জানিয়েছেন।

৩৪. মোঃ আমজের আলী (বীর মুক্তিযোদ্ধা), পিতা: মৃত আমিনদ্দীন গাজী, গ্রাম: সুলতানপুর, ইউনিয়ন: চন্দনপুর, উপজেলা: কলারোয়া, জেলা: সাতক্ষীরা, সাক্ষাৎকার গ্রহণের স্থান ও তারিখ: কলারোয়া উপজেলা মুক্তিযোদ্ধা কমান্ড কার্যালয়, ৮ জুলাই ২০২০।

৩৫. মোঃ আবুল হোসেন গাজী (বীর মুক্তিযোদ্ধা)।

৩৬. মোঃ আমজের আলী (বীর মুক্তিযোদ্ধা)।

৩৭. মোঃ আঃ জব্বার শেখ (বীর মুক্তিযোদ্ধা), পিতা: মৃত খলিল সানা, গ্রাম: বৈদ্যপুর, ইউনিয়ন: যুগিখালী, উপজেলা: কলারোয়া, জেলা: সাতক্ষীরা, সাক্ষাৎকার গ্রহণের স্থান ও তারিখ: কলারোয়া উপজেলা মুক্তিযোদ্ধা কমান্ড কার্যালয়, ৮ জুলাই ২০২০ খ্রিস্টাব্দ।

৩৮. আসমত আলী ওরফে যন্তর এর আদি বাড়ি ভারতের পশ্চিমবঙ্গে। পিতাসহ সে ও তার ভাইয়েরা '৪৭-এর পর কোন এক সময় পূর্ব পাকিস্তানে চলে আসলেও তার মা কখনো এখানে আসেনি। ফলে তার মায়ের নাম জানা সম্ভব হয়নি। এদেশে আসার পর যন্তর বিভিন্ন মুদি দোকানে কর্মচারি হিসেবে কাজ করত। তার দুহাত এত চালু ছিল যে, স্থানীয় লোকজন বিশেষ করে দোকানের খরিদ্দাররা তাকে যন্তর (যন্ত্র) বলে ডাকতে থাকে। এভাবে সে স্থানীয়ভাবে যন্তর নামে পরিচিত হয়ে এক সময় তার প্রকৃত নাম হারায়। উৎস: শেখ কোরবান আলী, পিতা: মৃত শেখ মহাতাব আলী, গ্রাম: রাড়ি পুকুর, পোস্ট: বাগআঁচড়া, উপজেলা: শার্শা, জেলা: যশোর। সাক্ষাৎকার গ্রহণের স্থান ও তারিখ: ডাঃ আফিল উদ্দীন কলেজ পট্টি, বাগআঁচড়া, ২৪ মার্চ ২০২১; মোঃ কুরবান আলী মোড়ল, পিতা: মোঃ জব্বার আলী মোড়ল, গ্রাম: বাগুড়ী, পোস্ট: বাগআঁচড়া, উপজেলা: শার্শা, জেলা: যশোর, তারিখ: ৩০ অক্টোবর ২০২০ খ্রিস্টাব্দ। উল্লেখ্য যে, কুরবান মোড়ল তখন জেএমসি-এর গুদামে লেবার হিসেবে কাজ করতেন, তখন তার বয়স ছিল ২৬ বছর।

৩৯. ওমর আলীর পিতার নাম হকির গাজী। তাঁর বড় ভাই একজন স্কুল শিক্ষক ছিলেন। ওমর স্কুলের বারান্দায় যেতে পারেননি, কিন্তু প্রচণ্ড দেশপ্রেমিক ছিলেন। তাঁর এলাকার অনেকেই যখন যুদ্ধে যাচ্ছিলেন তখন তিনি ভাবলেন আমিতো অনেক ছোট আর খান সেনারা অনেক বড় বড়। আমার ভাইয়ের মতো শিক্ষিত লোকেরা যদি তাদের মারতে পারে তাহলে আমি ছোট হলেও পেছন থেকে তো মারতে পারব। তিনি সিদ্ধান্ত নিলেন যুদ্ধে যাবেন, পিতার জমিতে লাঙ্গল চাষ ছেড়ে দিয়ে চলে গিয়ে সীমান্ত পাড়ি দিয়ে হাকিমপুর ভর্তি হলেন তারপর ঘোজাডাঙ্গা হয়ে বিহারে চলে গেলেন। তারপর বিহার ট্রেনিং সম্পন্ন করে চন্দনপুর ক্যাম্পে ঘাঁটি গাড়লে তাঁর উপর টেলিফোনের তার কেটে দেওয়ার দায়িত্ব বর্তায়। উৎস: ওমর আলী (বীর মুক্তিযোদ্ধা), পিতা: মৃত হকির গাজী, গ্রাম: কাউরিয়া, ইউনিয়ন: কেরালকাতা, উপজেলা: কলারোয়া, জেলা: সাতক্ষীরা, সাক্ষাৎকার গ্রহণের স্থান ও তারিখ: কলারোয়া উপজেলা মুক্তিযোদ্ধা কমান্ড কার্যালয়, তারিখ: ৩০ জুলাই ২০২০ খ্রিস্টাব্দ।

৪০. নাম প্রকাশে অনিচ্ছুক একজন প্রত্যক্ষদর্শী গবেষককে জানিয়েছেন যে, "সেদিন টেলিফোনের তার কেটে ফেলার শব্দ আমরাও ঘুমের মধ্যে পাই। কী হচ্ছে তা দেখতে বাইরে বের হয়ে দেখতে পাই দুজন লোক আলাউদ্দীন মিস্ত্রীর বাড়ির উত্তর-পূর্ব পাশের রাস্তা দিয়ে পালাচ্ছে এবং কিছুদূর পার হতেই তারা ধরা পড়ে। আর তার কাটার ঘটনাস্থলে তারা একবাক্স গুলি ও কাতুড় ফেলে যায়। সেগুলো স্থানীয় লোকেরা নিয়ে বাগআঁচড়া বাজারে রাজাকার ক্যাম্পে জমা দেয়। আজ আর ঐ লোকের নাম মনে নেই, তবে রাজাকাররা তাকে বেদম মাইর দিয়ে নাভারণ পাঠিয়ে দেয়।" উৎস: গ্রাম এবং পোস্ট: বাগআঁচড়া, উপজেলা: শার্শা, জেলা: যশোর, সাক্ষাৎকার গ্রহণের স্থান ও তারিখ: বাগআঁচড়া বাজার, ২৪ মার্চ ২০২০।

৪১. আব্দুল জলিল মৃত্যুবরণ করায় কারা আদম আলীকে ধরে নিয়ে গিয়েছিল তাদের নাম আর জানা যায়নি। তবে আদম আলীর স্ত্রী গবেষককে জানিয়েছেন, 'তাঁর স্বামীকে যে কয়জন ধরে নিয়ে গিয়েছিল, তার মধ্যে কাজীর বেড়ের আবু সাদ ছিল।' সাদ তাকে বাগআঁচড়ায় রেখে নাভারণে ফিরে এসেছিল। ফলে বাগআঁচড়া থেকে যেসব পাক মিলিশিয়া মুক্তিযোদ্ধাদের কাছে আটক হয়েছিল তার মধ্যে আবু সাদ ছিল না। সে ২০২১ সালের মার্চ মাসে মারা গেছে। উৎস: মোছাঃ হালিমা বেগম (মোঃ আদম আলীর বড় বোন), পিতা: দাউদ হোসেন, স্বামী: আব্দুল জলিল ওরফে রকেট জলিল, গ্রাম: পাল্লা, ডাক: পাল্লা বাজার, উপজেলা: ঝিকরগাছা, জেলা যশোর, সাক্ষাৎকার গ্রহণের স্থান ও তারিখ: নিজ বাড়ি, ২১ মার্চ ২০২১; মোছাঃ মনোয়ারা বেগম (মোঃ আদম আলীর স্ত্রী), পিতা: ইব্রাহিম মোড়ল, স্বামী: মোঃ আদম আলী, গ্রাম: কাজীর বেড়, বুরুজ বাগান, ডাক: যাদবপুর, উপজেলা: শার্শা, জেলা: যশোর, সাক্ষাৎকার গ্রহণের স্থান ও তারিখ: নিজ বাড়ি, ২১ মার্চ ২০২১।

৪২. উল্লেখযোগ্য ব্যাপার ছিল যে, বাগআঁচড়া সম্মুখযুদ্ধে আটক সকল রাজাকার বা মিলিশিয়া মারাত্মকভাবে আহত হলেও আদম আলী একেবারে অক্ষত ছিলেন। পরবর্তীকালে আরো একবার মোঃ আদম আলীকে নাভারণের স্থানীয় রাজাকাররা নাভারণ বাজারের দোকান থেকে ধরে বেনাপোলে অবস্থিত রাজাকার ক্যাম্পে নিয়ে যায়। তবে তখনো তিনি ভাগ্যক্রমে বেঁচে যান। উৎস: তদেব।

৪৩. ওমর আলী (বীর মুক্তিযোদ্ধা), পিতা: মৃত হকির গাজী, গ্রাম: কাউরিয়া, ইউনিয়ন: কেরালকাতা, উপজেলা: কলারোয়া, জেলা: সাতক্ষীরা, সাক্ষাৎকার গ্রহণের স্থান ও তারিখ: কলারোয়া উপজেলা মুক্তিযোদ্ধা কমান্ড কার্যালয়, তারিখ: ৩০ জুলাই ২০২০।

৪৪. মোঃ আমজের আলী (বীর মুক্তিযোদ্ধা), পিতা: মৃত আমিনদ্দীন গাজী, গ্রাম: সুলতানপুর, ইউনিয়ন: চন্দনপুর, উপজেলা: কলারোয়া, জেলা: সাতক্ষীরা, সাক্ষাৎকার গ্রহণের স্থান ও তারিখ: কলারোয়া উপজেলা মুক্তিযোদ্ধা কমান্ড কার্যালয়, ৮ জুলাই ২০২০।

৪৫. স্থানীয় লোকজন এসকল কাজে মুক্তিযোদ্ধাদের সর্বাত্মকভাবে সাহায্য করেছিলেন। উৎস: তৈয়ব উদ্দিন আহম্মদ (বীর মুক্তিযোদ্ধা), পিতা: মৃত ডাঃ ময়েজ উদ্দিন আহম্মদ, গ্রাম: চালিতাবাড়িয়া, ইউনিয়ন: কায়বা, উপজেলা: শার্শা, জেলা: যশোর, সাক্ষাৎকার গ্রহণের স্থান ও তারিখ: ঢাকা, তারিখ: ১৫ মার্চ ২০২১।

৪৬. তার পিতার নাম ছিল রহিম বক্স মোল্লা, বাড়ি বাগআঁচড়া পশ্চিম পাড়ায়। রাজাকার বদর উদ্দীনের চাচাতো ভাই ছিল সে। বদর উদ্দীনের সাথে সুসম্পর্ক থাকার কারণে লোকজন বদর উদ্দীনকে না পেয়ে ৬ ডিসেম্বর আনোয়ারকে বাড়ি থেকে ধরে নিয়ে বাগআঁচড়া শিশুতলায় অবস্থিত উলাকোলের আব্দুল বারিক মণ্ডলের কাপড়ের দোকানে বেঁধে রাখে। পরবর্তীতে ইলিশপুর, চালিতাবাড়িয়া, সাতমাইল প্রভৃতি এলাকার মুক্তিযোদ্ধারা এসে বাগআঁচড়া হাই স্কুল মার্কেটের স্থানে তখন যে বড় জামগাছ ছিল তার তলায় বেউনেট দিয়ে খুঁচিয়ে খুঁচিয়ে তাকে হত্যা করেন। উৎস: নাম প্রকাশে অনিচ্ছুক একজন প্রত্যক্ষদর্শী, গ্রাম এবং পোস্ট: বাগআঁচড়া, উপজেলা: শার্শা, জেলা: যশোর, সাক্ষাৎকার গ্রহণের স্থান ও তারিখ: বাগআঁচড়া বাজার, ২৮ মার্চ ২০২০।